মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাবী

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়

মূল
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী

অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭১৬৬৭১৪২৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : bic@accesstel.net



ISBN 984-842-006-1

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১
পঞ্চম প্রকাশ : মে ২০০৮

মুদ্রণ : আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

বিনিময় : সত্তর টাকা

'Matabirodhpurna Bishaye Sathik Pantha Abolambaner Upay' Written by Shah Waliullah Dehlavi Translated by Abdus Shahid Naseem Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 5th Edition May 2008 Price Taka 70.00 only.

সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগ থেকেই ইসলামে ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে আসছে। ইজতিহাদী মতপার্থক্য কখনো মুজতাহিদগণের খামখেয়ালীর কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ ইজতিহাদ এবং মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি ছিলো সুন্নাতে রাসূল (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের আছার। সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেয়ী এবং ইমাম মুজতাহিদগণের কালে মতপার্থক্য ইসলামের জন্যে ক্ষতিকর কিছু ছিলনা। বরঞ্চ তখন তা ছিল রহমত ও কল্যাণময়। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুলোক মতপার্থক্যকে বড় করে দেখতে থাকে। এটাকে বিদ্বেষ, গোঁড়ামী ও বিবাদ বিসম্বাদের হাতিয়ারে পরিণত করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দল উপদলের। অজ্ঞতাবশত এদের একদল নিজেদের মতকেই সঠিক আর ভিন্ন পক্ষের মতকে বেঠিক বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। ফলে সত্যসন্ধানী লোকেরা পড়েন বিপাকে। সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত।

এ ধরনের মতপার্থক্য ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোন্ মত গ্রহণীয় আর কোন্ মত বর্জনীয়, একজন সত্যসন্ধানী কিভাবে উভয় মতের মধ্যে সমতা বিধান করবে এবং তা অবলম্বনের জন্যে সঠিক পন্থাটাই বা কি সে সম্পর্কে মশহুর মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাবী তাঁর 'আল ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তিসিদ্ধ পর্যালোচনা ও সমাধান পেশ করেছেন।

গ্রন্থটি মুসলমানদের বিভিন্ন মসলকের মধ্যকার বিদ্বেষ, গোঁড়ামী, মতবিরোধ, বিবাদ বিসম্বাদ ও রেষারেষি দূর করে তাদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের মধ্যে গ্রথিত ইটসমূহের ন্যায় মজবুতভাবে ঐক্যবদ্ধ উম্মাতে পরিণত করতে দারুণভাবে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। সেই মহান উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অনেকদিন থেকেই গ্রন্থখানা অনুবাদ করার আশা পোষণ করে আসছিলাম। এ কাজের গুরুত্বের কথা আরো অনেকেই চিন্তা করেছেন, বলেছেন। অবশেষে করুণাময় আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিই। 'মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়' শিরোনামে সেই মূল্যবান গ্রন্থটিরই বংগানুবাদ পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। খ্যাতনামা আরব আলিম আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ সম্পাদিত এবং বৈরূতের 'দারুন নাফায়েস' কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৪ ঈসায়ীতে মুদ্রিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমার হস্তগত হয়। অপরদিকে ভারতে গ্রন্থটির উর্দূ অনুবাদ করেছেন খ্যাতনামা আলিম মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী। তিনি গ্রন্থটিকে 'ইখতিলাফী মাসায়েল মে ই'তেদাল কী রাহ' নাম দিয়েছেন এবং সুসম্পাদিত করেছেন। বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। সেগুলোতে চমৎকারভাবে শিরোনাম ও উপশিরোনাম বসিয়ে সহজবোধ্য করেছেন।

অনুবাদকালে আমি দু'টি গ্রন্থকেই সামনে রেখেছি। টীকা টিপ্পনীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে মাওলানা ইস্‌লাহী প্রদত্ত শিরোনাম ও উপশিরোনামসমূহ হুবহু গ্রহণ করেছি।

অনুবাদ চলাকালে গ্রন্থটি মাসিক পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ সহযোগিতার জন্যে আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক অধ্যাপক এ,কে,এম, নাজির আহমদ-এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী উলামায়ে কিরাম ও অন্যান্য শিক্ষিত সমাজকে ইজতিহাদী ও মাযহাবী মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত ও দৃষ্টিভংগি প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিন এবং এর গ্রন্থকার ও অনুবাদককে আদালতে আখিরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

আবদুস শহীদ নাসিম
সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। সালাত পেশ করছি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) প্রতি। এক সময় আল্লাহ্‌তায়ালা আমার অন্তরে সত্য ও ন্যায়ের জ্ঞান প্রতিভাত করে দেন। ফলে উম্মাতে মুহম্মদীয়ার মধ্যে বিরাজিত মতপার্থক্য ও মতবিরোধসমূহের কারণ এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট কোন্‌টি সত্য-সঠিক তা আমি উপলব্ধি করতে পারি। এসব বিষয়ের এমন সহজ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সমাধান পেশ করার যোগ্যতাও আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে দান করেন, যে ব্যাখ্যা ও সমাধান পেশ করার পর আর কোনো সংশয় ও জটিলতা বাকী থাকবে না।

অতপর লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং ইসলামী মিল্লাতের পরবর্তী মনীষীগণের মধ্যে মতপার্থক্যের, বিশেষ করে ফিকহী বিধি বিধানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণ কি ছিলো? আমি পরিবেশ ও প্রশ্নকর্তার জ্ঞানবুদ্ধি এবং ধারণ ক্ষমতার আলোকে সেইসব সত্যের একাংশ তাদের নিকট বর্ণনা করি, যা আল্লাহতায়ালা আমার অন্তরে প্রতিভাত করে দিয়েছিলেন। এসব বিবরণ একটি পুস্তিকার রূপ লাভ করে। আমি পুস্তিকাটির নাম রাখলাম ঃ 'আল ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ'।

১. মতবিরোধমুক্ত সোনালী যুগ ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ

আমাদের একালের মতো নবী করীমের (সা) যুগে ফিকহী মাসআলা মাসায়েল নিয়ে গবেষণা করা হতোনা। তাঁর সময় 'ফিকাহ্' নামে আলাদা কোনো বিষয়েরও অস্তিত্ব ছিলনা। জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পৃথক একটি বিভাগ হিসেবে 'ফিকাহ্' নামে কোনো বিষয়ের সংকলন সম্পাদনাও হয়নি। বর্তমানে আমাদের ফকীহ্রা (ইসলামী আইন বিশারদরা) যেভাবে দলিল-আদিল্লা ও যুক্তিপ্রমাণসহ পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব, মর্যাদা, বিধি-বিধান, শর্ত-শারায়েত ও প্রয়োগরীতি বর্ণনা করেন, সে সময় বিধি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন পদ্ধতি চালু ছিল না। এখন যেমন কোনো একটি সমস্যা (মাসআলা) কল্পনা করে নিয়ে তার উপর গবেষণা চালানো হয়; যেসব জিনিসের সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে, সেগুলোর যুক্তিভিত্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়; যেসব জিনিসের সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে সেগুলোর সীমা-পরিধি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়—এরূপ কোনো পদ্ধতি তখন ছিলনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ছিলো এর চাইতে ভিন্নতর। তাঁর তরীকা ছিলো এরূপ, যেমন ঃ তিনি অযু করতেন। সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষ করতেন, তিনি কি নিয়মে অযু করছেন। তারা তাঁর অযু দেখে দেখে তাঁর তরীকায় অযু করতেন। এটি অযুর রুকন, এই অংশ অযুর নফল কিংবা এটা অযুর আদব—এভাবে বিশ্লেষণ করে করে তিনি বলতেন না। একইভাবে, তিনি নামায পড়তেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নামায পড়া দেখতেন। তাঁর নামায দেখে দেখে তারাও তাঁর তরীকা অনুযায়ী নামায আদায় করতেন। তিনি হজ্জ পালন করেন। লোকেরা তাঁর হজ্জের রীতি পদ্ধতি অবলোকন করে এবং সেই অনুযায়ী নিজেরা হজ্জ পালন করতে শুরু করে। সাধারণত, এটাই ছিলো নবী করীমের (সা) শিক্ষাদান পদ্ধতি। তিনি কখনো ব্যাখ্যা করে করে বলেননি যে অযুতে চার ফরয, কিংবা ছয় ফরয। অযু করার সময় কখনো কোন ব্যক্তি যদি অযুর অংগসমূহ পরপর ধৌত না করে তবে তার অযু হবে কি হবেনা—এমন কোন ঘটনা আগে থেকে ধরে নিয়ে সে বিষয়ে আগাম কোনো বিধান জারি করা উচিত বলে তিনি কখনো মনে করতেন না। এরূপ ধরে নেয়া এবং অসংঘটিত অবস্থার বিধানের ক্ষেত্রে তিনি কদাচিতই কিছু বলেছেন।

অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অবস্থাও এই ছিলো, এ ধরনের ব্যাপারে

তারা নবী করীমকে (সা) খুব কমই প্রশ্ন করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাথীগণের চাইতে উত্তম কোনো মানব দল কখনো দেখিনি। রাসূলে খোদার গোটা যিন্দেগীতে তারা তাঁকে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছেন। এর সবগুলোই কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। যেমন ঃ 'ইয়াস্‌আলুনাকা আনিশ্ শাহ্‌রিল হারামি কিতালুন ফীহি'—'হে নবী এরা তোমাকে হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান জিজ্ঞেস করছে'। অথবা 'ইয়াস আলুনাকা আনিল মাহীদ'—হে নবী তাঁরা তোমার নিকট হায়েয সংক্রান্ত বিধান জানতে চাচ্ছে'—প্রভৃতি।

অতপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "সাহাবীগণ কেবল সেইসব প্রশ্নই করতেন, যা ছিলো তাঁদের জন্যে উপকারী।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ "তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যা বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। কারণ, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) এ ধরনের প্রশ্নকর্তাদের অভিসম্পাত করতে দেখেছি।"

কাসেম (রা) লোকদের সম্বোধন করে বলেন ঃ "তোমরা এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করছো, যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে আমরা কখনো মুখ খুলিনি। তাছাড়া তোমরা এমনসব বিষয়েও খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করছো যা আমার জানা নেই। সেগুলো যদি আমার জানা থাকতো, তবে তো নবী করীমের (সা) ফরমান অনুযায়ী সেগুলো তোমাদের বলেই দিতাম।"[১]

উমার ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন ঃ "রাসূলে খোদার (সা) অর্ধেকের বেশী সাহাবীর (রা) সংগে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি তাঁদের চাইতে অধিক জটিলতামুক্ত এবং কঠোরতা বর্জনকারী মানব গোষ্ঠীর সাক্ষাত পাইনি।"

উবাদা ইবনে বস্‌রকান্দী (রা) থেকে এই ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল ঃ "কোনো নারী যদি এমন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে তার কোনো ওলী পাওয়া যাবে না, সে অবস্থায় তাকে গোসল দেয়ানো হবে কিভাবে?" জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি এমন লোকদের সাক্ষাত লাভ করেছি,[২] যারা তোমাদের মতো কঠোরতা এবং জটিলতা অবলম্বন করতেন না। তাঁরা তোমাদের মতো

---

১. নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঐ আলিমের মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে, যে কোন বিষয়ে জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তাকে তা বলেনি। –অনুবাদক

২. অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (রা)। –অনুবাদক

(ধরে নেয়া বিষয়ে) প্রশ্ন করতেন না।"[৩]

মোটকথা, নবী করীমের (সা) যামানায় ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া দেয়ার রীতি এই ছিলো যে, লোকেরা বাস্তবে সংঘটিত বিষয়ে প্রশ্ন করতো এবং নবী করীম (সা) সে বিষয়ে বিধান বলে দিতেন। একইভাবে পারস্পরিক বিষয়াদি এবং মকদ্দমাসমূহ তাঁর সম্মুখে পেশ করা হতো। তিনি সেগুলো ফায়সালা করে দিতেন। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলে প্রশংসা করতেন আর মন্দ কাজ করতে দেখলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

---

৩. এই বাণী (আছার) গুলো সবই ইমাম দারমীর (রহ) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
—গ্রন্থকার

শায়খাইনের কর্মনীতি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণত সাহাবীগণের সাধারণ সভাতেই দ্বীনি কথাবার্তা বলতেন এবং শিক্ষা প্রদান করতেন। সে কারণেই দেখা যায়, শায়খাইন [হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)] তাঁদের খিলাফতামলে কোন বিষয়ের শরয়ী বিধান জানা না থাকলে তা অন্যান্য সাহাবীদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কোনো বক্তব্য শুনেছো?

হযরত আবু বকরের সম্মুখে যখন দাদীর ওয়ারিশী পাওয়া সংক্রান্ত মাসআলা উপস্থাপিত হলো, তখন বললেন, "দাদীর অংশ পাওয়া সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বাণী শুনিনি। তাই এ বিষয়ে আমি অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবো।" অতপর যোহর নামাজের পর তিনি সমবেত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কেউ দাদীর ওয়ারিশী পাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন বক্তব্য শুনেছো কি?"

মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বললেন ঃ 'হাঁ, আমি শুনেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি শুনেছো?' মুগীরা (রা) বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) দাদীকে মাইয়্যেতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন।" জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বিষয়টি তুমি ব্যতিত আর কারো জানা আছে কি?" মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা (রা) বললেন ঃ 'মুগীরা যথার্থ বলেছেন।'

তাদের বক্তব্য শুনার পর হযরত আবু বকর (রা) আবেদনকারী মহিলাকে তার মৃত নাতির রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দিয়ে দেন। এরূপ দুয়েকটি নয়, অসংখ্য ঘটনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে। যেমন ঃ হযরত উমারের নিকট গর্ভস্থ সন্তানের দিয়্যতের (রক্তমূল্য) বিষয়টি উত্থাপিত হলে এ বিষয়ে তাঁর কোন বিধান জানা না থাকায় তিনি এ প্রসংগে সাহাবায়ে কিরামের নিকট প্রশ্ন করেন। জবাবে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর রক্তমূল্য নির্ধারণ করেছেন 'গুররাহ'।[৪] তাঁর নিকট এ বিষয়ে নবী করীমের (সা) হাদীস

৪. 'গুররা' মানে একজন দাস মুক্ত করা কিংবা মৃতের ওলীকে পঞ্চাশ দীনার বা পাঁচশ' দিরহাম প্রদান করা। —অনুবাদক

শুনার পর হযরত উমার (রা) সে মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করেন। মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলের উপর দিয়ে সফর করা যাবে কিনা এ বিষয়ে হযরত উমার (রা) আবদুর রহমান ইবনে আউফের (রা) বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেন।[৫] মাজুসীদের (যরোষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বী) ব্যাপারেও তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করেন।[৬] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণিত হাদীস স্বীয় রায়ের সম্পূর্ণ সমার্থক পেয়ে সীমাহীন খুশী হন।[৭] হযরত আবু মূসা আশয়ারী কোন প্রয়োজনে উমার ফারুকের কাছে আসেন। দরজায় তিনবার অওয়াজ দেবার পরও কোন জবাব না পেয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অতপর হযরত উমার দরজা খুলে দূর থেকে তাঁকে ডেকে আনেন এবং ফিরে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "তিনবার আওয়াজ দেবার পরও অনুমতি না পাওয়া গেলে দরজা থেকে ফিরে যাবে।" উমার (রা) বললেন ঃ তোমার বর্ণনার সপক্ষে আরেকজন স্বাক্ষী লাগবে। অতপর হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) আবু মূসার (রা) বর্ণিত হাদীসের সত্যতা স্বীকার করলে হযরত উমার (রা) তা গ্রহণ করেন।

মতপার্থক্যের ভিত্তি, সূচনা ও কারণ

মোটকথা, নবী করীম (সা) সাধারণত মাসায়েল এবং আহকামে শরীয়াহ সাহাবায়ে কিরামের আ'ম ইজতেমায় ইরশাদ করতেন। একেকজন সাহাবী নবী করীমকে (সা) যে তরীকায় ইবাদত করতে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফায়সালা শুনেছেন, তিনি তা আয়ত্ত করে নেন এবং সেভাবে আমল করতে থাকেন। অতপর তিনি নবী করীমের (সা) এসব বক্তব্য ও আমলকে

৫. ঘটনাটি হলো, সিরিয়া অভিযানের সময় হযরত উমার (রা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন পথিমধ্যে কোনো একস্থানে গিয়ে জানতে পারেন সম্মুখের অঞ্চলগুলো ব্যাপক মহামারীতে (প্লেগ) আক্রান্ত। যাত্রা অব্যাহত রাখা না রাখার ব্যাপারে তিনি উপস্থিত লোকদের পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ এসে বললেন, নবী করীম (সা) মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে যেতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস শুনে তিনি বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। —অনুবাদক

৬. হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মাজুসীদের থেকে জিযিয়া আদায় করছিলেন না। অতপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন ঃ নবী করীম (সা) হিজরের মাজুসীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতেন। এ হাদীস শুনার পর তিনি তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করেন। —অনুবাদক

৭. এ রায় ছিলো এমন একজন মহিলার ব্যাপারে যার স্বামী এমন অবস্থায় মারা গেছেন যে, এখনো তিনি স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসেননি এবং তার মোহরও ধার্য করেননি। —অনুবাদক

অবলম্বন করে পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার বিচারে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করেন। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করেছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। এভাবে তাঁরা কোন হুকুমকে নির্ণয় করেন 'মুবাহ'। কোনোটিকে 'মুস্তাহাব' এবং কোনোটি 'মানসূখ'। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দার্শনিক দলিল প্রমাণ নয়, বরঞ্চ তাঁদের মনের প্রশান্তি ও প্রসন্নতাই ভূমিকা পালন করে। যেমন, তোমরা সরল সোজা গ্রাম্য লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। তারা অতি সহজে পরস্পরের কথা বুঝে ফেলে। তারা একজন অপরজনের কথার মধ্যকার ইশারা-ইংগিত, উপমা উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তার বক্তব্য বিষয়কে নির্দ্বিধায় পরিতুষ্টি সহকারে বুঝে নিতে পারে।

রাসূলে খোদার (সা) যুগ পর্যন্ত এভাবেই লোকেরা আমল করতো। অতপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যে যেখানে গেছেন, তিনিই সেখানকার জনগণের নেতৃত্ব লাভ করেন। এসময় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যাবলী তাদের সামনে আসতে থাকে। এসব বিষয়ে লোকেরা তাঁদের নিকট ফতোয়া ও ফায়সালা চান। প্রত্যেক সাহাবী তার নিকট রক্ষিত প্রমাণিত জ্ঞান (কুরআন-সুন্নাহ) দ্বারা কিংবা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে জবাব প্রদান করতেন। কোন বিষয়ে যদি এইভাবে সমাধান পাওয়া না যেতো তবে তাঁরা সে বিষয়ে ইজতেহাদ করতেন এবং যে কারণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর রাসূলে খোদা (সা) শরয়ী বিধান প্রদান করেছেন, তা জানার চেষ্টা করতেন। অতপর যে কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে যে মাসআলার সামঞ্জস্য দেখতে পেতেন, সেখানে তারা অনুরূপ বিধান প্রয়োগ করতেন। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা রাসূলে খোদার বিধান প্রয়োগ নীতি ও উদ্দেশ্যের পূর্ণ অনুবর্তন করতেন।

এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ তাকওয়া ও ঈমানদারীর সাথে নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগাতেন। এখান থেকেই সূচনা হয় তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের। আর এর কারণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো কয়েকটি মৌলিক ভিত্তির উপর ঃ

প্রথম কারণ ঃ রাসূলের হাদীস জানা থাকা না থাকার পার্থক্য

যেসব কারণের উপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কিরামের মতামতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার পায়লাটি হচ্ছে এই যে, কোনো একটি প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একজনের হয়তো রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্য জানা ছিলো, পক্ষান্তরে অন্য একজন সাহাবীর হয়তো সে বিষয়ে নবী করীমের (সা) বক্তব্য

জানা ছিল না যার ফলে সে বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ করেন। এরূপ ইজতিহাদের কয়েকটি অবস্থা হতো। যেমন ঃ

এক. কখনো এরূপ ইজতিহাদ হাদীসে রাসূলের (সা) অনুরূপ হয়ে যেতো। ইমাম নাসায়ী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে এর উদাহরণ। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) নিকট এমন একজন মহিলার (মহরানা) প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হয়, যার স্বামী তার মহরানা নির্ধারণ এবং সান্নিধ্যে গমণের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, এ বিষয়ে রাসূলল্লাহর (সা) কোন ফায়সালা আমার জানা নেই । কিন্তু এ বিষয়ে যে কোন একটি ফায়সালা দেয়ার জন্য লোকেরা তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে । তখন তিনি বিষয়টির উপর ইজতিহাদ করে এই ফায়সালা প্রদান করেন ঃ মহিলাটিকে এমন পরিমাণ মোহর দিতে হবে, যা তার সমমর্যাদার মহিলারা পেয়ে থাকে। এর চাইতে কমও না বেশীও নয়। তাছাড়া মহিলাটিকে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং সে তার স্বামীর রেখে যাওয়া ধনসম্পদ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করবে।" এ ফায়সালা শুনার সাথে সাথে হযরত মা'কাল ইবলে ইয়াসার (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাবীলার জনৈক মহিলার ব্যাপারে ঠিক অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছিলেন।" তাঁর সাক্ষ্য শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এতোটা আনন্দিত হন, যতোটা ইসলাম কবুল করার পর থেকে ঐসময় পর্যন্ত আর কখনো হননি।

দুই. কখনো এমন হতো যে, কোনো একটি মাসআলা সম্পর্কে দু'জন সাহাবীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হতো। এ আলোচনার মাধ্যমে রাসূলের (সা) কোনো হাদীস তাঁদের সামনে এসে যেতো এবং হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে প্রবল আস্থা জন্ম নিতো। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ সেই হাদীসটির কথা উল্লেখ করা যায়, যেটি হাদীসের ইমামগণ হযরত আবু হুরাইরা (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই যে, হযরত আবু হুরাইরার ধারণা ছিলো ঃ "যার উপর গোসল ফরয হলো (জুনুবী), সে যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে, তবে তার রোযা হয় না।" কিন্তু নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ কেউ যখন নবী করীমের (সা) আমল এ ধারণার বিপরীত ছিলো বলে বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু হুরাইরা তাঁর ধারণা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিন. আবার কখনো এমন হতো যে, ইজতিহাদকারী সাহাবীর নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস পৌঁছেছে বটে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ বর্ণনাটি পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের ইজতেহাদের উপর আমল করতেন। এর উদাহরণ পাওয়া যায় ফাতিমা বিন্‌তে কায়েসের (রা) একটি হাদীস থেকে যা ছয়টি সহীহ্ গ্রন্থেই (সিহাহ সিত্তায়) বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ "ফাতিমা বিন্‌তে কায়েস (রা) হযরত উমারের (রা) সম্মুখে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকতে আমাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি আমাকে ইদ্দতকালীন খোরপোষ দেয়ার নির্দেশ দেননি এবং তালাক দেয়া স্বামীর বাড়ীতেও থাকতে দেননি।" হযরত উমার (রা) ফাতিমার (রা) এ বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ "আমরা একজন নারীর কথায় আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করতে পারি না।[৮] তাছাড়া তার বক্তব্য সঠিক

---

৮. এখানে কুরআনের কয়েকটি আয়াতাংশের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা তালাকে বলা হয়েছে ঃ "ওয়ালা তুখ্‌রিজুহুন্না মিন বুয়ুতিহিন্না" (ইদ্দতকালে তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিওনা)। এবং "আস্‌কিনূহুন্না মিন্ হাইসু সাকান্‌তুম মিন বুজদেকুম" (তাদের উদ্দতকালে তাদের সেই বাসগৃহে থাকতে দাও তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা নিজেরা যে বাসগৃহে থাকো)। এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, ইদ্দতকালে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না। বরঞ্চ তালাকপ্রাপ্তাকে এ সময়ের জন্যে নিজের ঘরে থাকতে দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। তাছাড়া কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ "আনফিকু আলাইহিন্না" (তাদের ব্যয়ভার বহন করো)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইদ্দতকালে স্বামীকে তালাকপ্রাপ্তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আয়াতাংশগুলো অর্থ প্রকাশের দিক থেকে পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন ও সাধারণ অর্থবোধক। এখানে নির্দিষ্ট করে কেবল 'তালাকে রিজ্‌য়ী' (ফেরতযোগ্য তালাক) দেয়া নারীর কথা বলা হয়নি। তাই এ আয়াতগুলোর হুকুম সব ধরনের তালাক দেয়া নারীর উপরই প্রযোজ্য। এই সাধারণ হুকুমটির প্রেক্ষিতেই হযরত উমার (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা) বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তার বর্ণনাটি ছিলো কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী।

হযরত উমারের (রা) এই কর্মপন্থা থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি লাভ করি। ফাতিমা (রা) ছিলেন একজন সাহাবী। উসূলে হাদীস অনুযায়ী 'আস্‌সাহবাতু কুল্লুহুম উদূল।' আর ফতিমাও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর বর্ণনা কুরআনের স্পষ্ট অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে হযরত উমার (রা) তা গ্রহণ করেননি। এতে বুঝা গেল, হাদীস বিচারে কেবল সনদই বিবেচ্য নয়, বরঞ্চ বক্তব্য বিষয়ও (মতন) খতিয়ে দেখতে হবে। সোনালী সূত্রের মধ্যেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পাবে। সূত্রের (সনদ) বিশুদ্ধতা সর্বাবস্থায় হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা) বর্ণনার মধ্যে তো সূত্রগত দুর্বলতার কোনো অবকাশ ছিল না। (সঃ ইসলাহী)

কি ভুল তাও নিশ্চিত বলা যায় না। তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে অবশ্যি খোরপোষ এবং বাসস্থান দিতে হবে।" তাছাড়া "আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) খোরপোষ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেননি" ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা) একথা শুনতে পেয়ে হযরত আয়িশা (রা) বলে উঠলেন ঃ "ফাতিমার কি হলো? সেকি আল্লাহকে ভয় করে না?"

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। এ উদাহরণটির বর্ণনা বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে ঃ "হযরত উমার (রা) মনে করতেন, জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) যদি গোসলের জন্য পানি না-ও পায়, তবু তায়াম্মুম দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না।"

অতপর হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) তাঁকে নিজের ঘটনা শুনালেন। তিনি বলেন, "একবার আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসংগী ছিলাম। আমার গোসলের জরুরত হলো। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। তাই তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে ধুলায় গড়াগড়ি করে নিলাম। পরে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানালাম। তিনি বললেন, তোমার এতোটুকু করাই যথেষ্ট ছিল। (একথা বলতে বলতে) তিনি নিজের দু'হাত যমীনে মারলেন এবং সেখান থেকে উঠিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ্ করে দেখালেন।" হযরত উমারের (রা) দৃষ্টিতে আম্মারের এ বর্ণনায় কোনো দুর্বলতা ছিলো। ফলে তিনি তার এই বক্তব্য গ্রহণ করলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে বর্ণনাটি প্রামাণ্য দলিল (হুজ্জত) ছিল না। অবশ্য পরবর্তীতে হাদীসটি মশহুর হয়ে যায় এবং দুর্বল হবার ধারণা চাপা পড়ে যায়। ফলে লোকেরা তার উপর আমল করতে থাকে।

চার. কখনো এমন হতো যে, মুজতাহিদ সাহাবীর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসই পৌঁছেনি। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মহিলাদেরকে গোসল করার সময় মাথার চুল খুলে নিতে হুকুম করতেন। হযরত আয়িশা (রা) ব্যাপারটি জানতে পেরে বিস্মিত হয়ে বললেন, "ইবনে উমারের কি হলো, কেন তিনি মহিলাদেরকে চুল খোলার নির্দেশ দেন? এমন হলে তো তাদেরকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে বললেই হয়। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) একই পাত্রে গোসল করতাম। আমি কখনো চুল খুলতাম না শুধুমাত্র মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিতাম।"

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণটি পাওয়া যায় ইমাম যুহ্রী বর্ণিত একটি ঘটনায়। তাহলো ঃ "হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহার একথা জানা ছিল না যে, কোনো নারীর

যদি দশ দিনের বেশী ঋতুস্রাব হতে থাকে, তবে দশম দিনের পর তাকে নামায পড়তে হবে। এ কারণে তিনি সেসময় নামায পড়তেন না। আর নামায পড়তে না পারার কারণে সবসময় কান্নাকাটি করতেন।"

দ্বিতীয় কারণ ঃ রাসূলের কাজের ধরন নির্ণয়ের পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার দ্বিতীয় কারণটি ছিলো এই যে, তাঁরা নবী করীমকে (সা) একটি কাজ করতে দেখেছেন। (কিন্তু মানবিক চিন্তার প্রকৃতিগত তারতম্যের কারণে কাজটির ধরন ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়)। ফলে কেউ রাসূলের (সা) উক্ত কাজটিকে মনে করেছেন ইবাদত আর কেউ মনে করেছেন মুবাহ। এ ব্যাপারে দু'টি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে 'তাহসীবের'। মানে হজ্জের সফর উপলক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) আবতাহ উপত্যকায় অবতরণের ঘটনা। আসহাবে উসূল ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) দৃষ্টিতে এই অবতরণের কাজটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই তাঁরা এটাকে হজ্জের সুন্নাত বলে গণ্য করতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) মতে, তিনি সেখানে ঘটনাক্রমে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং সেটা হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে এই যে, "সাধারণ মুসলমানদের মতে, খানায়ে কা'বার তাওয়াফের সময় 'রম্‌ল্‌' করা সুন্নাত। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) মতে রাসূলুল্লাহ (সা) যে 'রম্‌ল্‌' করেছিলেন, তা ছিলো একটা আকস্মিক ঘটনা। তিনি তা করেছিলেন ঘটনাক্রমে। অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের একটি ভর্ৎসনার জবাবে তিনি সাময়িকভাবে এ কাজ করেছিলেন। তারা বলতো ঃ 'মদীনার জ্বরেরা মুসলমানদেরকে বিচূর্ণ ও ক্লান্ত করে ছেড়েছে।' এ ভর্ৎসনার জবাবে তিনি মুসলমানদের নিতান্তই সাময়িকভাবে 'রম্‌ল্‌' করার হুকুম দিয়েছিলেন। এটি হজ্জের স্থায়ী কোন সুন্নাত নয়।"

তৃতীয় কারণ ঃ ধারণাগত বিশ্লেষণের পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার তৃতীয় কারণটি হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) কাজসমূহের কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের ধারণাগত বিশ্লেষণ। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ সম্পাদন করেছেন আর সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা প্রত্যক্ষ করেছেন। পরে তারা লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহর সেই হজ্জের ধরন

বর্ণনা করতে গিয়ে নিজ নিজ ধারণামত কেউ বলেছেন, তিনি 'হজ্জে তামাত্তু' করেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি 'হজ্জে কেরান' করেছেন আবার কারো মতে সেটা ছিল 'হজ্জে ইফরাদ'।[৯]

এর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে আবু দাউদে সংকলিত হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন ঃ "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বললাম, হে আবুল আব্বাস! হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যে তালবিয়া[১০] পাঠ করেছিলেন, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখে আমার কাছে বিস্ময় লাগছে।" আমার বক্তব্য শুনে ইবনে আব্বাস বললেন:

"এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা আমার সবার চাইতে বেশী জানা আছে। আসলে রাসূলুল্লাহ (সা) একটিই মাত্র হজ্জ করেছিলেন। আর এই জন্যেই সে হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। অতপর তিনি মসজিদে যুলহুলাইফায় দু'রাকায়াত নামায আদায় করার পর সেখানেই হজ্জের ইহরাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ করেন। সেখানে তাঁর আশেপাশে যারা ছিলেন, তারা তাঁর এই তালবিয়া পাঠ শুনেন এবং মনে রাখেন। অতপর তিনি উটে আরোহণ করেন। উট তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলে তিনি পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। এ সময় আবার অপর কিছু লোক তা শুনতে পায়। ব্যাপার হলো, সফর ব্যপদেশে সহাবীগণের পৃথক পৃথক দল একের পর এক রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে আত্মনিয়োগ করে তাঁর পাশে থাকতেন। সে কারণে উট তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করার সময় তাঁর পাশে যারা ছিলেন, তারা তখনকার তালবিয়া শুনতে পান এবং তারা মনে করে বসেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল তখনই তালবিয়া পাঠ করেছেন যখন যুলহুলাইফার মসজিদ থেকে উটে করে যাত্রা শুরু করেন।

৯. 'তামাত্তু' সে ধরনের হজ্জকে বলে, যাতে হজ্জের মাসগুলোতে মক্কা গিয়ে উমরা আদায় এবং মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলা হয়। অতপর জিলহজ্জ মাসের আট তারিখে আবার নতুন করে ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা হয়। 'কেরান' সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে উমরা এবং হজ্জ উভয়টার জন্যে একত্রে ইহরাম বাঁধা হয় এবং উভয়টা সমাপ্ত করার পর ইহরাম খোলা হয়। আর উমরাবিহীন হজ্জকে ইফরাদ বলা হয়। –অনুবাদক

১০. হজ্জের তালবিয়া হচ্ছে "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্। লা-শারীকালাকা লাব্বাইক্। ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাক্। ওয়াল মুলকা লা-শারীকালাক্। –অনুবাদক

অতপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়দা উপত্যকা অতিক্রমকালে এর উপরে উঠলে পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। এ সময় আরেক দল লোক তাঁর তালবিয়া শুনতে পায়। এরা মনে করে বসে রাসূলুল্লাহ (সা) শুধুমাত্র বায়দা উপত্যকা অতিক্রমকালেই তালবিয়া পাঠ করেছেন অথচ, খোদার কসম, জায়নামাযে থাকতেই তিনি হজ্জের নিয়ত করেছিলেন। অতপর উট তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করার পরও তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং বায়দা অতিক্রমকালেও তালবিয়া পাঠ করেছেন।"

চতুর্থ কারণ ঃ ভুলে যাবার কারণে মতপার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার চতুর্থ কারণ হচ্ছে ভুলচুক (যা মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক কিছু নয়)।

এর উদাহরণ হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সম্পর্কিত একটি বর্ণনা। তিনি (ইবনে উমার) বলতেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) একটি উমরা করেছেন রজব মসে।" তার এ বক্তব্য অবগত হলে হযরত আয়িশা বললেন ঃ "ইবনে উমার ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।"[১১]

পঞ্চম কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য আয়ত্ত করা না করার পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কখনো কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্যের যথার্থ ও পূর্ণ উদ্দেশ্য সকলে সমানভাবে আয়ত্ত করে রাখতেন না। এর উদাহরণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (সা) সূত্রে হযরত ইবনে উমার (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।" এ বক্তব্য শুনে হযরত আয়িশা (রা) বললেন ঃ এটা ইবনে উমারের ধারণা প্রসূত কথা। রাসূলুল্লাহ্‌র বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থানকাল পাত্র তিনি আয়ত্ত করে রাখেননি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ইয়াহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার কালে দেখলেন, তার আপনজনরা তার জন্যে মাতম করছে। তিনি বললেন ঃ "এরা এখানে তার জন্যে

---

১১. জামউল ফাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬; বর্ণনা ঃ উমার এবং ইবনে উমার (রা)।
—অনুবাদক

কান্নাকাটি করছে, অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে।"[১২]

এখানে হযরত ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন, কান্নাকাটির কারণে মাইয়্যেতের আযাব হয়েছে এবং ব্যাপারটা সাধারণভাবে সকল মাইয়্যেতের জন্যেই প্রযোজ্য। অথচ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) বক্তব্য ছিলো কেবল উক্ত মাইয়্যেতের জন্যে নির্দিষ্ট (খাস) এবং বক্তব্যে তিনি কান্নাকাটিকে আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি।

৬ষ্ঠ কারণ ঃ বিধানের কারণ নির্ণয়গত পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেসব কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তন্মধ্যে আরেকটি হচ্ছে এই যে, কোনো বিধান স্থির করার পেছনে কি কারণ ছিলো তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মতের বিভিন্নতা। যেমন, কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানো। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন, ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো হয়, কেননা প্রত্যেক কফিনের সাথেই ফেরেশতারা শামিল হয়। এ মতানুযায়ী মৃতব্যক্তি মুমিন হোক কিংবা কাফির সর্বাবস্থায়ই দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুভীতির কারণে দাঁড়ানো হয়। এ মতানুযায়ীও যে কোনো ধরনের লোকের কফিনের জন্যে দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট দিয়ে এক ইয়াহুদীর কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাঁর মাথার উপর দিয়ে ইয়াহুদীর লাশ অতিক্রম করা তিনি পছন্দ করলেন না। তাই তিনি দাঁড়ালেন। এটি যদি সঠিক কারণ হয়ে থাকে, হবে কেবল দাঁড়ানোটা কাফিরের কফিনের জন্যে নির্দিষ্ট।

৭ম কারণ ঃ সামঞ্জস্যবিধানগত পার্থক্য

সপ্তমত, কোনো বিধানের বৈপরীত্য নিরসনকল্পে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাইবার যুদ্ধের সময় 'মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতপর 'আওতাস' যুদ্ধের সময় পুনরায় মুতআর অনুমতি প্রদান করেন। এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন।

---

১২. এ ঘটনা 'মুসনাদে আহমদে' বর্ণিত হয়েছে। —অনুবাদক

এখন এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) মত হলো, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'মুতআর' অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন শেষ হবার সাথে সাথে অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্যে এ অনুমতি স্থায়ী। (অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে মুতআ বিয়ে করা যাবে। আর প্রয়োজন দূরীভূত হলে তা নিষিদ্ধ।) কিন্তু সাধারণ সহাবীগণের মত এর বিপরীত। তাঁদের মত হলো, মুতআ বিয়ের অনুমতিটা ছিলো মুবাহ পার্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রদ (মান্‌সূখ) করে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু সাহাবীর মত হলো, এ নিষেধাজ্ঞা সাধারণ এবং রদযোগ্য নয়। কিন্তু ওফাতের এক বছর পূর্বে হযরত জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। তাই তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) এই কাজ এ সংক্রান্ত তাঁর পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে রদ করে দিয়েছে। এমনিভাবে হযরত ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) কিবলার দিকে পিছু দিয়ে এবং সিরিয়ার দিকে মুখ করে ইস্তেঞ্জা করতে দেখেছেন। এর ভিত্তিতে তিনি তাদের মতকে রদ করে দিয়েছেন যারা বলেন, কিবলার দিকে পিছু দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ। অতপর কিছু লোক এই উভয়মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। ইমাম শা'বী প্রমুখ মত দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নিষেধাজ্ঞা ছিলো খোলা উন্মুক্ত জায়গার বেলায়। কেউ যদি পায়খানা বা টয়লেটে বসে ইস্তেঞ্জা করে, তখন কিবলার দিকে মুখ করে বা পিছু দিয়ে বসলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ কেউ আবার ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী এবং সাধারণ। তবে হযরত জাবির (রা) এবং ইবনে উমার (রা) যা দেখেছেন, সেটা করা নবী হিসেবে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁর জন্যে বৈধ ছিলো। সুতরাং তাঁর সে কাজ এ সংক্রান্ত তাঁর নিষেধাজ্ঞাকে রদ করে না। তাছাড়া কোনো বিশেষ স্থানে কিবলামুখী বা কিবলাকে পিছু দিয়ে ইস্তেঞ্জা করাও বৈধ বলে প্রমাণ করেনা।

৩. মতবিরোধের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ ঃ তাবেয়ীগণের যুগ

তাবেয়ীগণের মতপার্থক্য

এভাবেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এ মতপার্থক্য তাবেয়ীদের নিকট পৌঁছে। প্রত্যেক তাবেয়ীর নিকট যা কিছু পৌঁছে তিনি সেটাকে আয়ত্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহর (সা) যে যে হাদীস এবং সাহাবীগণের যে যে মতামত শুনেছেন, তা তাঁরা তাঁদের স্মৃতিতে অংকিত করে নেন। সাহাবীগণের বক্তব্যে যেসব ইখতিলাফ লক্ষ্য করেছেন, নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। কখনো একটি বক্তব্যকে আরেকটি বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনো কোনো বক্তব্য তাঁদের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমনকি তা যদি প্রথম শ্রেণীর কোনো সাহাবীর বক্তব্যও হয়ে থাকে। যেমন, 'তায়াম্মুম দ্বারা ফরয গোসলের কার্যসমাধান হয় না'– হযরত উমার (রা) এবং ইবনে মাসউদের (রা) এ মতকে তারা গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে এ প্রসংগে তাঁরা হযরত আম্মার (রা) এবং ইমরান ইবনে হুসাইন প্রমুখের মশহুর রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে এসে তাবেয়ীগণের মধ্যেও স্বভাবিকভাবে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন মত। আর বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের আলিমদের নেতৃত্ব। যেমন ঃ

ক) মদীনায় সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহ) এবং সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রহ) মতামত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁরা মদীনার জনগণের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। এ দু'জনের পর মদীনায় যুহুরী, কাযী ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ এবং রবীয়া ইবনে আবদুর রহমান অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেন।

খ) মক্কায় আতা ইবনে আবি রিবাহ্ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তাদের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।

গ) কুফায় ইব্রাহীম নখয়ী এবং শা'বী এ মর্যাদা লাভ করেন।

ঘ) বসরায় এ মর্যাদা লাভ করেন হাসান বসরী।

ঙ) ইয়েমেনে লাভ করেন তাউস ইবনে কাইসান আর

চ) সিরিয়ায় মাকহুল।

অতপর আল্লাহ্‌তায়ালা কিছুলোকের অন্তরে এঁদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দেন। এভাবে তারা এঁদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের (রা) বক্তব্য ও ফতোয়া এবং এই লোকদের মতামত ও বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেন। অতপর তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে আসে অসংখ্য লোক। তাদের সম্মুখে আসে হাজারো মাসায়েল। উত্থাপিত হয় শত শত মামলা মুকাদ্দামা। (এ সকল বিষয়ে তাদেরকে ফতোয়া দিতে হয় এবং ব্যক্ত করতে হয় নিজেদের মতামত)।

ফিকাহ সংকলনের সূচনা

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং ইব্রাহীম নখয়ী প্রমুখ যথানিয়মে বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক ফিকাহ সংকলন করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে তাঁরা কিছু মূলনীতির অনুসরণ করেন, যা তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের থেকে লাভ করেছেন।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং তাঁর ছাত্ররা এ মত পোষণ করতেন যে, হারামাইনের বাসিন্দারা ফিকাহ্‌র ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী। তাঁদের মতামতের (মাযহাবের) ভিত্তি ছিলো হযরত উমার (রা) ও উসমানের (রা) ফতোয়া ও ফায়সালাসমূহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আয়িশা (রা) ও ইবনে আব্বাসের (রা) ফতোয়াসমূহ এবং মদীনার কাযীগণের ফায়সালা ও রায়সমূহ। আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত তাওফীক অনুযায়ী তাঁরা এসকল বিধান ও ফতোয়া সংগ্রহ করেন এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলো পর্যালোচনা করেন। অতপর (ক) যে বিষয়ে মদীনার আলিমগণের ঐক্যমত পেয়েছেন, সেটা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। (খ) যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিলো সে বিষয়ে ঐ মতকে গ্রহণ করেন, যা কোনো না কোনো কারণে মজবুত এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এসব কারণ আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকতে পারে। যেমন, অধিকাংশ আলিম কর্তৃক সে মতটি গ্রহণ করা, কিংবা কিয়াসের ভিত্তি মজবুত হওয়া, বা সরাসরি কুরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে গবেষণা করে নির্ণয় করা কোনো ফায়সালার সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া অথবা অন্য কোনো কারণে। (গ) আর যে বিষয়ে তাদের কোনো ফতোয়া এরা লাভ করেননি, সে বিষয়ে তাঁদের অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্য ও ফতোয়াসমূহের উপর গবেষণা করতেন, সেগুলোর উদ্দেশ্য, ইংগিত ও দাবী খুঁজে বের করতেন এবং সে অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁরা অসংখ্য মাসায়েল ও বিধান রচনা করেন।

ইব্রাহীম নখয়ী এবং তাঁর ছাত্রদের ধারণা ছিলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর শিষ্যগণই ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাধিক দক্ষ। যেমন, আলকামা মাসরুককে বলেছিলেন ঃ "সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চাইতেও বড় কোনো ফকীহ ছিলেন কি?" একইভাবে আবু হানীফা (রহ) ইমাম আওযায়ীকে বলেছেন ঃ "ইব্রাহীম নখয়ী সালিম ইবনে আবদুল্লাহর চাইতে বড় ফকীহ। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যদি সাহাবীর মর্যাদা লাভ না করতেন, তবে আমি বলতাম, আলকামা তাঁর চাইতে বড় ফকীহ। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদতো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদই। তাঁর সাথে আর কার তুলনা হয়?" মূলত: ইব্রাহীম নখয়ী ও তাঁর ছাত্রদের ফিক্হী মসলকের ভিত্তিই ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতামত ও ফতোয়া, হযরত আলীর (রা) ফতোয়া ও ফায়সালাসমূহ, কাযী শুরাইহ্র ফায়সালাসমূহ এবং কুফার অন্যান্য কাযীর ফায়সালাসমূহের উপর। ইব্রাহীম নখয়ী তাঁর সাধ্যানুযায়ী এইসব ফতোয়া, ফায়সালা ও বিধান সংগ্রহ করেন এবং এগুলো ঠিক সেইভাবে কাজে লাগান, যেভাবে মদীনায় সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব প্রমুখ সেখানকার সাহাবী ও পরবর্তী আলিমদের বক্তব্য (আছার) ও ফতোয়াসমূহ কাজে লাগান। এগুলোর ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে অসংখ্য মাসায়েল উদঘাটন করেন। ফলশ্রুতিতে এখানেও ফিকাহ্র প্রতিটি অধ্যায়ে মাসায়েলের স্তূপ জমা হয়ে যায়।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব ছিলেন মদীনার ফকীহদের মুখপাত্র। মদীনার ফকীহদের মধ্যে হযরত উমারের (রা) ফায়সালাসমূহ এবং আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর চাইতে অধিক কারো মুখস্থ ছিল না । আর ইব্রাহীম নখয়ী ছিলেন কুফার ফকীহদের মুখপাত্র। এঁরা দু'জন কারো সূত্র উল্লেখ না করে যখন কোনো মাসআলা বর্ণনা করতেন, তখন তার অর্থ এ হতো না যে, কারো সূত্র ছাড়াই স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে মাসআলাটি প্রদান করেছেন। বরঞ্চ সাধারণত এসব মাসায়েল তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অতীতের কোনো ফকীহ্র সূত্রেই বর্ণনা করতেন। শেষ পর্যন্ত এ দুজনকে ঘিরে উভয় শহরে গড়ে উঠে বিরাট ফকীহ গোষ্ঠী। তাঁরা দু'জন দুই স্থানে এই শাস্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অসংখ্য লোক তাঁদের থেকে লাভ করেন ফিকাহ্র ইল্ম। তাঁদের এসব ছাত্ররাও আবার গবেষণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাসআলা বের করেন। বের করেন মাসআলার শাখা প্রশাখা এবং খুঁটিনাটি অনেক বিষয়।

উলামায়ে তাবে'তাবেয়ীন

তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হবার পর আল্লাহ তায়ালা ইল্‌মে দীনের আরেক দল বাহক সৃষ্টি করেন। এতে করে ইল্‌মে দীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো ঃ " ইয়াহ্‌মিলু হা-যাল্ ইল্‌ম মিন্ কুল্লি খালাফিন্ উদুলুহু– প্রত্যেকটি ভবিষ্যত বংশধরের ন্যায়পরায়ণ লোকেরা এই ইল্‌মের আমানত বহন করবে।" ইল্‌ম দীনের এই বাহক দল সেই দায়িত্বই পালন করেছেন। এঁরা ছিলেন তাবেয়ীগণের ছাত্র তাবে'তাবেয়ীন। তাঁরা তাবেয়ীগণের নিকট থেকে তাঁদের সংগৃহীত অযু, গোসল, সালাত, হজ্জ, বিয়ে-শাদী, লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান যাবতীয় বিষয়ের শরয়ী পন্থাসমূহ সংগ্রহ করেন; রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস সংগ্রহ এবং বর্ণনা করেন; বিভিন্ন শহরের কাযীদের ফায়সালা এবং মুফতীদের ফতোয়া সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তাঁরা তাঁদের থেকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করেন এবং সকল বিষয়ে নিজেরাও ইজতিহাদ করেন । এভাবে তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ আলিমের মর্যাদা লাভ করেন। জনগণ তাঁদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং শরয়ী ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত বলে গ্রহণ করে। এঁরাও আবার নিজ নিজ শিক্ষকের পন্থা অবলম্বন করেন। অতীত আলিমগণের বক্তব্য ও ফতোয়ার উদ্দেশ্য ও দাবী অনুধাবনের ক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠার সাথে নিজেদের পূর্ণ প্রতিভাকে কাজে লাগান। নিজেদের অগাধ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরাও মানুষকে ফতোয়া দান করেন, বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা প্রদান করেন, হাদীস বর্ণনা করেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দেন।

তাবে' তাবেয়ী আলিমগণের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি

এ স্তরের আলিমগণের চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি ছিলো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের চিন্তা ও কর্মের এই সামঞ্জস্যের সারসংক্ষেপ হলোঃ

১. তাঁদের দৃষ্টিতে 'মুসনাদ হাদীস' যেমন গ্রহণযোগ্য ছিলো, অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলো 'হাদীসে মুরসাল'[১৩]

---

১৩. যে হাদীসের সাথে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করা হয়, সেটা হলো 'মুসনাদ (সনদযুক্ত) হাদীস'। আর সনদ উল্লেখ করা ছাড়াই কোনো তাবেয়ী বা

(অপর পৃষ্ঠায়)

২. তাঁরা সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের বক্তব্যকে শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ প্রসংগে তাঁদের দৃষ্টিভংগি এই ছিলো যে :

(ক) শরয়ী বিষয়ে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, সেগুলো হয়তো রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস হিসেবেই তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তবে সংক্ষিপ্ত করে 'মওকুফ'[১৪] করেছেন। যেমন, ইব্রাহীম নখয়ী সরাসরি এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাকালা[১৫] এবং মুযাবানা[১৬] করতে নিষেধ করেছেন।" তাঁর মুখ থেকে এ হাদীসটি শুনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "এটি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) অন্য কোনো হাদীস কি আপনার মুখস্থ নেই?" তিনি বললেন, "অবশ্যি আছে। তবে, 'আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেছেন, 'আলকামা বলেছেন' এভাবে বলতেই আমি বেশী ভালবাসি।"

একইভাবে ইমাম শা'বীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং বলা হয়, হাদীসটির সনদ কি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছানো যায়না? তিনি বললেন : আমার দৃষ্টিতে সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছানো ঠিক না। কারণ বক্তব্যের মধ্যে যদি কিছু কম বেশী থাকে, এভাবে তা রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি আরোপিত হবেনা। বরঞ্চ যে সাহাবীর নিকট আমি শুনেছি তাঁর প্রতিই আরোপিত হবে।

(খ) কিংবা, তাঁদের বক্তব্যগুলো হলো সেইসব শরয়ী বিধান, যা তাঁরা কুরআন সুন্নাহ্ থেকে অনুসন্ধান করে বের করেছেন, বা নিজেরা ইজতিহাদ করে নির্ণয় করেছেন। এই মনীষীদের গবেষণা ও ইজতিহাদ সম্পর্কে একথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদের তুলনায় অনেক উন্নত কর্মপন্থা এবং বিশুদ্ধতম চিন্তা ও মতামতের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া, পরবর্তী লোকদের তুলনায় তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকতর কাছাকাছি সময়ের এবং অধিক

তাবেতাবেয়ী সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাকে 'হাদীসে মুরসাল' বলে। –অনুবাদক

১৪. 'মওকুফ' হচ্ছে সেই হাদীস যার সূত্র (সনদ) সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সূত্র উল্লেখ ছাড়াই সাহাবী যে বক্তব্য প্রদান করেন, সেটাই মওকুফ হাদীস। –অনুবাদক

১৫. খোশা ছাড়ানো গমের স্থলে খোশাযুক্ত গম বিক্রি করাকে 'মুহাকালা' বলে। –অনুবাদক

১৬. মুযাবানা হলো নিজ ক্ষেতের ফসল আনুমানিক পরিমাণ ধরে একথা বলে বিক্রি করা যে, বেশী হলে ফেরত নেব না আর কম হলে আমি গচ্চা দেব। –অনুবাদক

ইল্‌মের অধিকারী লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য অনুসরণীয় এবং অনুবর্তনীয়। তবে, সে অবস্থাতে তাঁদের বক্তব্যের উপর আমল করার ক্ষেত্রে জটিলতা ও বাধা রয়েছে, যখন কোনো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে চরম মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা তাঁদের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) তাবে' তাবেয়ী ইমামগণের কর্মনীতিতে তৃতীয় যে সামঞ্জস্যটি পাওয়া যায়, তা হলো এই যে, কোনো বিষয়ে যদি তাঁরা পরস্পরবিরোধী হাদীসের সন্ধান পেতেন, তবে সে বিষয়ে শরয়ী বিধান অবগত হবার জন্যে সাহাবায়ে কিরামের (রা) বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন। সাহাবীগণ যদি পরস্পরবিরোধী হাদীসগুলোর কোনোটিকে মানসূখ বা তা'বীলযোগ্য বলে উল্লেখ করে থাকেন কিংবা বিলুপ্তি (নসখ) বা তাবদীলের কোনো ব্যাখ্যাদান ছাড়াই তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একমত হয়ে থাকেন, যার অর্থ মূলত হাদীসটিকে জয়ীফ, মানসূখ কিংবা তাবীলযোগ্য বলে ঘোষণা করা,—এই সকল অবস্থাতেই তাঁরা সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ ঐ হাদীসকে তাঁরা ততোটুকুই মর্যাদা ও গুরুত্ব দান করতেন, যতোটুকু মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম (রা)। এর উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের ঝুটা বরতনের বিধান প্রসংগের হাদীস[১৭] সম্পর্কে ইমাম মালিকের (রহ) বক্তব্য। হাদীসটি সম্পর্কে তিনি বলেন, "এটিতো হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর হাকীকত বা তাৎপর্য আমি বুঝতে অক্ষম।"[১৮] অর্থাৎ অতীত ফকীহগণকে (সাহাবীগণকে) আমি এর উপর আমল করতে দেখিনি।

(৪) তাঁরা যখন কোনো বিষয়ে সাহাবী, এবং তাবেয়ীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে বলে দেখতে পেতেন, তখন তাঁদের প্রত্যেক আলিমই নিজ নিজ শহরের সাহাবী ও তাবেয়ী এবং নিজ নিজ উস্তাদের মত অনুসরণ করতেন। কেননা তিনি তাঁদের বক্তব্যের মজবুতী ও দুর্বলতা সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য ও রায় যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের মর্যাদা, কামালিয়াত ও

---

১৭. হাদীসটি হলো ঃ কোনো পাত্রে কুকুর মুখ ঢুকালে তা সাতবার ধুইয়ে নাও অতপর একবার মাটি দিয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে নাও। –অনুবাদক

১৮. ইবনে হাজিব এ ঘটনা তাঁর 'মুখতাস-সারুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। –অনুবাদক

সমুদ্রসম জ্ঞানের প্রতিও ছিলেন তিনি আকৃষ্ট। (সুতরাং এমনটি করা তাঁদের প্রত্যেকের জন্যেই ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার)। এর ফলে মদীনাবাসীদের নিকট উমার, উসমান, ইবনে উমার, আয়িশা, ইবনে আব্বাস, যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং তাঁদের সেরা ছাত্র সায়ীদ (রহ) ইবনে মুসাইয়্যেব (রহ) [যিনি হযরত উমারের (রা) ফায়সালা এবং আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস সমূহের সর্বাধিক হাফিয ছিলেন], উরওয়া, সালিম, আতা, কাসিম, ইকরামা[১৯] উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ যুহরী, ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ, যায়িদ ইবনে আসলাম ও রবীয়া (রহ) প্রমুখের চিন্তাধারা ও মতামত (মাযহাব) অন্য সকলের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিলো। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার বিরাট মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা বলে গেছেন[২০] এবং মদীনা সবসময়ই ফকীহ ও আলিমদের কেন্দ্র ছিলো বলেও তারা এমনটি করে থাকতে পারেন। এ কারণেই দেখা গেছে, ইমাম মালিক (রহ) মদীনার আলিমগণের মতামতকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে একথা মশহুর হয়ে গেছে যে, তিনি মদীনাবাসীদের 'ইজমা'কে 'হুজ্জতে শরয়ী' (আইনের প্রমাণ) রূপে গ্রহণ করতেন। ইমাম বুখারীও তাঁর গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন "মক্কা ও মদীনা (হারামাইন)বাসীদের সর্বসম্মত বিষয়কে গ্রহণ করা।"

পক্ষান্তরে কুফাবাসীদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর শাগরেদদের বক্তব্য, হযরত আলীর (রা) রায় ও ফায়সালা, কাযী শুরাইহ ও শা'বীর ফায়সালা এবং ইব্রাহীম নখয়ীর ফতোয়াসমূহ অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য ও অধিকতর অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এ কারণেই তাশরীক[২১] প্রসংগে আলকামা মাসরুককে যায়িদ ইবনে সাবিতের (রা) বক্তব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়তে দেখে বলেছিলেন' "কোনো সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) চাইতেও অধিকতর শরীয়াহ সংক্রান্ত বুঝ-সমঝ রাখতেন কি?"

জবাবে মাসরুক বললেন, "রাখতেন না বটে, তবে আমি যায়িদ ইবনে

---

১৯. ইকরামার নাম এখানে উল্লেখ হলেও তাঁকে এই উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা যাবে না। কারণ সর্বসম্মতভাবে তিনি ছিলেন মক্কার অধিবাসী। –অনুবাদক

২০. হাদীসটি হলো ঃ বিদ্যান্বেষণের জন্য লোকেরা অচিরেই মদীনার দিকে যান বাহন দৌড়াবে। আর মদীনার আলিমরা হবে শ্রেষ্ঠ আলিম। –অনুবাদক

২১. 'তাশরীক' মানে বর্গা চাষ বা জমির মালিক কর্তৃক ফসল ভাগাভাগি ভিত্তিতে নিজের জমি অপরকে চাষ করতে দেয়া। –অনুবাদক

সাবিত (রা) এবং অপরাপর মদীনাবাসীকে তাশরীক করতে দেখেছি।"

মোটকথা, এভাবে এ যুগের প্রত্যেক আলিমের নিকট তাঁর উস্তাদ এবং নিজ শহরের শাসক, কাযী ও আলিমগণের ফায়সালা ও মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য এবং অধিকতর অনুসরণযোগ্য ছিলো। নিজ শহরের ওলামাকে কোনো বিষয়ে একমত দেখতে পেলে সে বিষয়টিকে তো তাঁরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতেন। এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কেই ইমাম মালিক বলেন, "যেসব সুন্নাতের বিষয়ে (আহলে মদীনার) কোনো মতপার্থক্য নেই, সেগুলো তো আমাদের নিকট এরূপ এরূপ।" (অর্থাৎ প্রমাণিত ও অবশ্যকরণীয়)। কোনো বিষয়ে নিজ শহরের ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখতে পেলে সে অবস্থায় তাঁরা ঐ মতটিকে গ্রহণ করতেন। আর 'মজবুত ও অগ্রাধিকারযোগ্য' মনে করতেন। আর 'মজবুত ও অগ্রাধিকারযোগ্য' নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা 'অধিকাংশের মত' কিংবা 'মজবুত কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত' অথবা 'কিতাব ও সুন্নাহ্র নীতিমালার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল' প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ প্রসংগে ইমাম মালিকের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি মদীনার আলিমদের সম্পর্কে বলতেন, "তাঁদের থেকে আমি যা শুনতে পেয়েছি তা কতোইনা উত্তম।"

নিজ শহরের সাহাবী, তাবেয়ী এবং আলিমগণের বক্তব্য ও মতামত থেকে সরাসরি যদি তাঁরা কোনো মাসআলার জবাব না পেতেন, তখন তাঁরা তাঁদের বক্তব্য ও মতামতের আলোকে গবেষণা করে এবং তাদের বক্তব্য ও মতামতের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন।

এই যুগের আলিমগণের অন্তরে ফিকাহ্র গ্রন্থাবলী সংকলনের অনুভূতি ইলহাম করে দেয়া হয়েছিল। তাইতো দেখা যায়, মদীনায় ইমাম মালিক এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবিযিব' মক্কায় ইবনে জুরাইজ এবং ইবনে উয়াইনা, কুফায় সওরী এবং বসরায় রুবাই ইবনে সুবাইহ্ পৃথক পৃথকভাবে ফিকাহ্গ্রন্থ সংকলন করেন। সংকলনকালে এরা সকলেই সেই নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন যার প্রতি আমি এতোক্ষণ আলোকপাত করলাম।

৫. প্রসিদ্ধ ফিক্হী মাযহাবসমূহ

(১) ইমাম মালিক ও মালিকী মাযহাব

খলীফা মানসুর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এলে ইমাম মালিককে বললেন, "আমি আপনার গ্রন্থাবলীর কপি করিয়ে সেগুলো মুসলমানদের সকল শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে এ কিতাবগুলোরই অনুসরণ করতে হবে এবং এগুলো ত্যাগ করে অন্য কোনো মতের অনুসরণ করা যাবে না।" জবাবে ইমাম মালিক বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, এমনটি করবেন না। কারণ, বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন মত পৌঁছেছে, বিভিন্ন ধরনের হাদীস তারা শুনেছে এবং বিভিন্ন রকম বর্ণনা তাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে লোকেরা যে ধরনের হাদীস ও মতামত শুনেছে, তারা তারই উপর আমল করে আসছে। এভাবে লোকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের অনুসারী লোক রয়েছে। তাই লোকদের তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিন। যে শহরের লোকেরা যে মত (মসলক)-এর অনুসরণ করছে, তাদেরকে তাই অনুসরণ করতে দিন।"

কেউ কেউ এ ঘটনাটি খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারুনুর রশীদ ইমাম মালিকের নিকট পরামর্শ চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মুআত্তা খানায়ে কা'বায় উৎকীর্ণ করে দিয়ে লোকদেরকে সকল মতপার্থক্য ত্যাগ করে এর অনুসরণ করতে বাধ্য করলে কেমন হয়?" জবাবে ইমাম বললেন, "এমনটি করবেন না। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাহাবীগণের মধ্যেই খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিলো। অতপর তাঁরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন শহরে তাঁদের নিজ নিজ মতের অনুসারী লোক সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে লোকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকেই চলে আসছে।" তাঁর বক্তব্য শুনে হারুনুর রশীদ বললেন, "আবু আবদুল্লাহ! আল্লাহতায়ালা আপনাকে দীন সম্পর্কে আরো অধিক বিজ্ঞতা দান করুন।" এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম সুয়ূতী।

মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক ছিলেন সেসব হাদীসের শ্রেষ্ঠতম আলিম। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সনদগত দিক থেকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া হযরত উমারের (রা)

ফায়সালাসমূহ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ও তাঁদের ছাত্র সপ্ত ফকীহর[২২] বক্তব্য ও মতামত সম্পর্কে তাঁর চাইতে বড় আলিম আর কেউ ছিল না। এই মহান আলিম এবং তাঁর মতো অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আলিমদের হাতেই ইল্‌মে রাওয়ায়াত ও ইলমে ইফতা'র ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইল্‌ম ও ইরশাদের সনদরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হাদীস বর্ণনা, ফতোয়া দান, ইজতিহাদ ও জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক যে বিরাট অবদান রেখে যান, তা দ্বারা নবী করীমের (সা) সেই ভবিষ্যতবাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছিলেন, "অচিরেই লোকেরা উটে আরোহণ করে ইলম হাসিলের জন্যে ছুটোছুটি করবে। কিন্তু মদীনার আলিমের চাইতে বড় কোনো আলিম তারা পাবে না।" ইবনে উয়াইনা ও আবদুর রায্যাকের মতো সেরা চিন্তাবিদদের মতে রাসূলুল্লাহর (সা)এই ভবিষ্যতবাণী ইমাম মালিকের মাধ্যমে সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্ররা তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস ও মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁরা এগুলোর সম্পাদনা করেন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এগুলোর মূলনীতি ও দলিল-আদিল্লা নিয়ে গবেষণা করেন এবং এরি ভিত্তিতে তাঁরা আরো অধিক মাসায়েল উদ্ভাবন করেন। এসব পাথেয় সাথে নিয়ে তাঁরা মরক্কো ও পৃথিবীর অন্যান্য দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা উপকৃত করেন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে। ইমাম মালিকের মাযহাবের এই হচ্ছে মূলকথা। তুমি যদি আমার বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাও, তবে মুআত্তায়ে মালিক পড়ে দেখো। এখানে আমরা যা কিছু বলেছি গ্রন্থটিতে তার সত্যতা খুঁজে পাবে।

(২) ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাব

ইমাম আবু হানীফা কঠোরভাবে ইব্রাহীম নখয়ী ও ইব্রাহীম নখয়ীর স্বখেয়ালের উলামায়ে তাবেয়ীনের মসলক অনুসরণ করেন। কদাচিতই তিনি তাঁদের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হতেন। এই মসলকের ভিত্তিতে পূর্ণ দক্ষতার সাথে মাসায়েল বের করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিরাট মর্যাদার অধিকারী। মাসায়েল তাখরীজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও যুক্তিবাদী। তাঁর পুরো দৃষ্টি

২২. এই সাতজন ফকীহ্ হলেন ঃ (১) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (২) উরওয়া ইবনে যুবায়ের (৩) কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (৪) আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী (৫) খারিজা ইবনে যায়িদ ইবনে সাবিত (৬) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ মাসউদী (৭) সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হিলালী। –অনুবাদক

নিবদ্ধ ছিলো ক্ষুদ্র ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের প্রতি। তুমি যদি তাঁর সম্পর্কে আমার মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চাও, তবে ইমাম মুহাম্মাদের 'কিতাবুল আছার', আবদুর রায্যাকের 'জামে' এবং আবু বকর ইবনে শাইবার 'মুসান্নেফ' গ্রন্থ থেকে ইব্রাহীম নখয়ীর বক্তব্যগুলো বেছে বেছে বের করে নাও। অতপর আবু হানীফার মাযহাবের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখো। তুমি দেখতে পাবে, দুয়েকটি জায়গা ছাড়া কোথাও তাঁর কদম ইব্রাহীম নখয়ীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মসলক থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর সেই ব্যতিক্রম দুয়েকটি জায়গায়ও আবু হানীফা নিজের পক্ষ থেকে অভিনব কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি, বরঞ্চ কুফারই অন্য কোনো না কোনো ফকীহ্‌র অনুসরণ করেছেন।

আবু হানীফার ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক মশহুর ছিলেন আবু ইউসুফ। হারুনুর রশীদের শাসনকালে ইনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর এই পদে নিয়োগ লাভের ফলে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয়ভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাক, খোরাসান ও তুরান সর্বত্রই এ মাযহাব রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হয়।

তাঁর অপর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনের দিক থেকে অন্য সকলের তুলনায় অগ্রগণ্য ছিলেন। দারস ও তাদরীসের ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি অনন্য। প্রথমত তিনি আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফের নিকট থেকে ফিকাহ্‌র জ্ঞান লাভ করেন। অতপর মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিকের নিকট থেকে 'মুআত্তা' শিক্ষা লাভ করেন। অতপর নিজেই চিন্তা গবেষণার কাজ শুরু করেন। স্বীয় উস্তাদ আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের প্রত্যেকটি মাসআলা মুআত্তার আলোকে পর্যালোচনা করেন। যেগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলো তো আনন্দ চিত্তেই গ্রহণ করেছেন। আর যেগুলোতে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য পেয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে পুনরায় গবেষণা করেছেন। তন্মধ্যে যেটিকে কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর মতের অনুরূপ পেয়েছেন, সেটির ব্যাপারেও হানাফী মসলককেই গ্রহণ করেন। আর যেটিকে দুর্বল কিয়াস ও দুর্বল ইস্তেম্বাতের উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছেন এবং ফকীহদের অনুসৃত সহীহ্ হাদীস ও অধিকাংশ আলেমের মতের বিপরীত পেয়েছেন, সেটির ব্যাপারে নিজের মাযহাব ত্যাগ করে অর্থাৎ আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের সাথে একমত না হয়ে সাহাবী কিংবা তাবেয়ীদের মধ্য থেকে এমন কারো মত গ্রহণ করেছেন, যার মতটি তার কাছে সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

আবু হানীফার এ দু'জন ছাত্র তাঁরই মতো যথাসম্ভব ইব্রাহীম নখয়ীর মাযহাবের

অনুসরণ করেছেন। তবে দু'টি অবস্থায় কখনো কখনো উস্তাদের (আবু হানীফা) সাথে তাদের মতপার্থক্য হয়েছে :

১. কখনো এমন হয়েছে যে, আবু হানীফা ইব্রাহীম নখয়ীর মাযহাবের ভিত্তিতে কোনো মাসআলা বের করেছেন, কিন্তু আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ এই তাখরীজকে গ্রহণ করেননি।

২. কখনো এমন হতো যে, কোনো একটি মাসআলার ব্যাপারে ইব্রাহীম নখয়ীসহ কুফার অন্যান্য ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়া যেতো, যেখানে কোনো একটি মতকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো। এমতাবস্থায় অনেক সময় তাঁদের মত আবু হানীফার মতের অনুরূপ হতো না।

আগেই বলেছি, ইমাম মুহাম্মাদ গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রতি দৃষ্টিবান ছিলেন। তিনি এই তিন জনের[২৩] রায়সমূহ সংকলন করে ফেলেন, যার ফলে উপকৃত হতে থাকে অসংখ্য মানুষ। পরবর্তী সময় হানাফী আলিমগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁরা এগুলোর সার নির্যাস বের করেন, সম্পাদিত করেন, তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সহজে বুঝাবার উপযোগী করে তোলেন। সেগুলোর ভিত্তিতে আরো অনেক মাসায়েল ইস্তেম্বাত করেন এবং দলিল-আদিল্লা যুক্ত করে সেগুলোকে মজবুত করেন। অতপর তারা এসব গ্রন্থাবলী সাথে নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে প্রাচ্যের দিকে ছড়িয়ে পড়েন আর সেসব গ্রন্থের সকল মাসায়েল আবু হানীফার মাযহাব বলে গণ্য হতে থাকে।

এভাবে আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদের মাযহাবও আবু হানীফার (রহ) মাযহাব বলেই গণ্য হতে থাকে। তিনজনকে একই মাযহাবের সাথে একাকার করে ফেলা হয়। অথচ এঁরা দুজনই ছিলেন স্বাধীন মুজতাহিদ। আবু হানীফার সাথে মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য মোটেও কম ছিল না। তাদেরকে একই মাযহাবের বলে গণ্য করার কারণ এই ছিলো যে,

১. একটি ব্যাপারে তাদের তিনজনের মধ্যেই মিল ছিলো অর্থাৎ তারা তিনজনই একজনের (ইব্রাহীম নখয়ী) মাযহাবের অনুসারী।

২. দ্বিতীয়ত, 'মাবসূত' এবং 'জামেউল কবীর' গ্রন্থে তাঁদের তিন জনের মাযহাবই একত্রে সংকলিত হয়েছে।

---

২৩. অর্থাৎ ইব্রাহীম নখয়ী, আবু হানীফা ও আবু ইউসূফ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

(৩) ইমাম শাফেয়ী এবং শাফেয়ী মাযহাব

উপরোক্ত দুটি মাযহাবের (মালিকী ও হানাফী) প্রসিদ্ধি এবং মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সংকলনের সূচনাকালেই শাফেয়ীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি গভীরভাবে পূর্ববর্তীদের চিন্তা ও গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা করেন। তাঁদের ইস্তেম্বাত ও ইস্তেখরাজের পদ্ধতি তিনি বিশ্লেষণ করেন। এতে কিছু বিষয়ে তাঁর মনে খটকা সৃষ্টি হয়। তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ 'কিতাবুল উম্মে'র প্রথমদিকেই এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

ক. তিনি দেখলেন, তাঁরা (মদীনা ও কুফার ফকীহ্গণ অর্থাৎ মালিকী ও হানাফীগণ) 'মুরসাল ও মুন্কাতি' হাদীসও গ্রহণ করেছেন।[২৪] এর ফলে তাদের বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি (খলল) প্রবেশ করেছে। হাদীস বর্ণনার সবগুলো পন্থা জমা করলে দেখা যায় বহু মুরসাল হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। বহু মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী কতগুলো শর্ত পূর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত মুরসাল হাদীস গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শর্তগুলো উসূলের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে।

খ. তিনি দেখলেন, তাঁরা ইখতিলাফপূর্ণ প্রমাণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করেননি। যা অনুসরণ করলে তাঁদের ইজতিহাদসমূহ ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (মাহফুয) হতো। সুতরাং শাফেয়ী এ বিষয়ে মূলনীতি (উসূল) ও বিধি নির্ধারণ করে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থই উসূলে ফিকাহ্র পয়লা গ্রন্থ।

পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে তাঁর এই দ্বিতীয় বিশ্লেষণটির উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা গেলো ঃ একদিন ইমাম শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মাদের কাছে এলেন। দেখলেন, তিনি বক্তব্য রাখছেন এবং বক্তব্যে এই বলে মদীনার ফকীহ্দের অভিযুক্ত করছেন "তারা মকদ্দমার ফায়সালার জন্যে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য জরুরী মনে করেনা, বরঞ্চ একজনের সাক্ষ্য এবং সেইসাথে বাদীর শপথের ভিত্তিতে ফায়সালা (রায়) দিয়ে দেয়। অথচ এটা আল্লাহ্র কিতাবের সাথে মানুষের মতের সংযোজন।"

---

২৪. মুরসাল হচ্ছে সেই হাদীস, যা কোনো তাবেয়ী মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর মুনকাতি হলো সেই হাদীস, যার বর্ণনাকারীদের (সনদের) ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। –অনুবাদক

তাঁর বক্তব্য শুনে শাফেয়ী বললেন, "খবরে ওয়াহিদ[২৫] দ্বারা কিতাবুল্লাহ্‌র উপর কিছু সংযোজন করা বৈধ নয়, এটা কি আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ!"

এবার শাফেয়ী বললেন, "তবে আলা লা অসীয়্যাতা লিওয়ারিছিন"—সাবধান, ওয়ারিশের জন্যে অসীয়াত করা যাবে না'[২৬] —হাদীসটির ভিত্তিতে ওয়ারিশের জন্যে অসীয়াত করা যাবে না বলে আপনি কেমন করে মত দিয়েছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ কুতিবা আলাইকুম ইযা হাদারা আহাদাকুমুল মাউতু ইন্ তারাকা খাইরানিল অসিয়্যাতু লিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবীনা বিল মা'রুফ– তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যেতে থাকে, তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসীয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হলো।'[২৭] এটা কি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের উপর সংযোজন নয়?"

এভাবে শাফেয়ী মুহাম্মাদের প্রতি আরো কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করলেন। এর ফলে মুহাম্মাদ চুপ হয়ে যান।

গ. তিনি দেখলেন, উলামায়ে তাবেয়ীন, যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিলো– কোনো কোনো সহীহ হাদীস তাদের নিকট পৌঁছেইনি। তাই, হাদীসে রাসূলে স্পষ্ট বিধান রয়েছে, এরূপ মাসায়েলও কখনো কখনো তাদের কাছে এলে হাদীস জানা না থাকার ফলে তারা সে বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন, কিংবা সাধারণ ধারণামতে ফতোয়া দিয়েছেন অথবা কোনো সাহাবীর কর্মনীতিকে অবলম্বন করে সে অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন। অতপর কখনো এমন হয়েছে যে, পরবর্তীতে তৃতীয় স্তরে এসে সে সংক্রান্ত হাদীস নজরে এলো। কিন্তু তারপরও ফকীহগণ তা গ্রহণ করেননি এবং সে অনুযায়ী আমল করেননি। তাদের ধারণা ছিলো ঃ এ হাদীস তো আমাদের শহরের পূর্ববর্তী আলিমগণের আমল

---

২৫. খবরে ওয়াহিদ হলো সে হাদীস, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল যুগেই তিন জন, দুই জন কিংবা একজন ছিলো। –অনুবাদক

২৬. বুখারী, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য হলো হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ শ্রেণীর্ভুক্ত। –অনুবাদক

২৭. দেখুন, সূরা আল-বাকারা, ১৮০। –অনুবাদক

এবং মাযহাবের বিপরীত। সুতরাং এতে কোনো না কেনো দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়েছে, যার ফলে তা তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আবার কখনো এমন হয়েছে যে, সে হাদীসগুলো তৃতীয় স্তরে এসেও সকলের নজরে আসেনি। এসেছে আরো পরে যখন মুহাদ্দিসগণ পৃথিবীর দিক দিগন্তে হাদীস সংগ্রহের জন্যে ছড়িয়ে পড়েন এবং হাদীসের বিভিন্ন তরীকা ও সনদ সংগ্রহের কাজে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বহু হাদীসের অবস্থা এমন হয়েছে, যেগুলোর বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা এক বা দুইয়ের অধিক ছিলো না। তাঁদের থেকে শুনে পরবর্তীদের যারা শুনিয়েছেন তাদের সংখ্যাও এক বা দুইয়ের অধিক ছিল না। এমনি করে পরবর্তীতেও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কমই থেকে যায়। এর ফলে এই দীর্ঘ সময়কাল হাদীসগুলো সাধারণ ফকীহ্‌দের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যায়। অতপর হাদীসের সেইসব মহান হাফিযদের যুগে এসে সেগুলো সকলের নজরে আসে, যারা বিভিন্ন তরীকায় বিভিন্ন সূত্র ও উৎস থেকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন।

তাছাড়া আবার এমনও হয়েছে যে, বিরাট সংখ্যক হাদীস কেবল একই অঞ্চলের লোকেরা বর্ণনা করে এসেছেন। যেমন একটি হাদীস প্রত্যেক যুগেই কেবল বস্‌রার লোকেরাই বর্ণনা করে এসেছে এবং অন্যান্য স্থানের লোকেরা সেই হাদীসটির কোনো খবরই জানতো না।

এই বাস্তব বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য হলো, আমাদেরকে সাহাবী এবং তাবেয়ী আলিমগণের নীতি অনুসরণ করা উচিত। তাঁদের সামনে যখন কোনো মাসআলা আসতো, তখন প্রথমেই তাঁরা সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস অনুসন্ধান করতেন। সে সংক্রান্ত কোনো হাদীস পাওয়া না গেলে কেবল তখনই তারা অন্য প্রকার দলিল ও যুক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা নিজেদের জন্যে হাদীস গ্রহণের দরজা বন্ধ করে দিতেন না। বরঞ্চ যখনই সেই সংক্রান্ত কোনো হাদীস তাঁদের অবগতিতে আসতো, সাথে সাথে নিজেদের ইজতিহাদ পরিত্যাগ করে সেই হাদীসকে গ্রহণ করতেন। বাস্তব ঘটনাই যখন এই, তখন তাঁরা কোনো হাদীসকে গ্রহণ করেননি বলেই তা দুর্বল হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে তাঁরা কোনো হাদীসের দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ হবার কথা স্পষ্টভাবে বলে গিয়ে থাকলে তা আলাদা কথা। এর উদাহরণ হচ্ছে হাদীসে

কিল্লাতাইন।[২৮] বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি একটি সহীহ হাদীস। অধিকাংশ সূত্রের (সনদের) প্রথম দিকের রাবীগণ হলেন, "হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ওলীদ ইবনে কাসীর, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে যুবায়ের কিংবা মুহাম্মাদ ইবনে ইবাদ ইবনে জাফর, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)।" পরবর্তীকালে সনদটির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়। এই দুইজন রাবীই (মুহাম্মাদ ইবনে জাফর এবং মহাম্মাদ ইবনে ইবাদ) যদিও পূর্ণ বিশ্বস্ত, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা ফতোয়া দানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে কারণে হাদীসটি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং যুহুরীর যামানায় খ্যাতি লাভ করেনি আর তা মালিকী এবং হানাফীদের দৃষ্টিতেও আসেনি। ফলে তাঁরা এর ভিত্তিতে আমল করেননি। কিন্তু শাফেয়ীর যামানায় হাদীসটি খ্যাতি লাভ করে এবং তিনি তার ভিত্তিতে আমল করেন।

এর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে খিয়ারে মজলিসের হাদীস।[২৯] এটি একটি সহীহ হাদীস এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমার এবং আবু হুরাইরা (রা) এর উপর আমলও করেছেন। কিন্তু যেহেতু হাদীসটি সপ্তফকীহ এবং তাঁদের সমকালীনদের অবগতিতে আসেনি, সে কারণে তাঁরা তার উপর আমলও করেননি। আর হাদীসটির উপর এঁদের আমল না করার কারণে মালিক এবং আবু হানীফার দৃষ্টিতে হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু শাফেয়ী হাদীসটির উপর আমল করেন।

ঘ. শাফেয়ীর যামানায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) কওল সর্বাধিক সংগ্রথিত হয়। এসব বক্তব্য ছিলো ব্যাপক বিস্তৃত ও ইখতিলাফপূর্ণ। তিনি এসব কওলের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। ফলে এর একটা বিরাট অংশ তিনি সহীহ

২৮. কিল্লাতাইন 'কিল্লাতুন'-এর দ্বিবচন। কিল্লাতুন মানে বড় মটকা যাতে পাঁচশ' রতল পানি ধরে। হাদীসটি হলো ঃ "ইযা কানা বালাগাল মাউ কিল্লাতাইন লাম ইয়াহমিলিল খুবুস্– দুই কিল্লা পরিমাণ পানিতে নাজাসাত পড়লে তা নাপাক হয় না।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, দারেমী)। –অনুবাদক

২৯. হাদীসটি হলো ঃ "ক্রয়-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ক্রয় বা বিক্রয় বাতিল করবার ইখতিয়ার থাকে।" ইমাম মালিক মুআত্তায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এর ভিত্তিতে আমল করেননি। –অনুবাদক

হাদীসের বিপরীতে দেখতে পান। কারণ এ হাদীসগুলো সকল সাহাবীর নিকট পৌঁছেনি। তিনি আরো দেখলেন, এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে অতীতের আলিমগণ সাহাবীদের কওল ত্যাগ করে হাদীসের দিকে রুজু করতেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তিনিও সাহাবীদের কওল অনুসরণ করেননি। তিনি বলতেন, সাহাবীগণও মানুষ আমরাও মানুষ।৩০

ঙ. তিনি আরো দেখলেন, একদল ফকীহ 'রায়' এবং 'কিয়াস'কে একাকার করে ফেলেছে। উভয়টির মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী রাখছে না। অথচ শরীয়ত 'রায়'কে নাজায়েয এবং 'কিয়াস'কে জায়েয ও মুস্তাহ্সান বলে আখ্যায়িত করে। এই লোকগুলো কখনো কখনো 'রায়কে' ইস্তেহ্সান বলে থাকে। তিনি বলেন, আমি 'রায়' বলতে কোনো ক্রুটি কিংবা যুক্তির ধারণা বা সম্ভাবনাকে কোনো বিধানের ভিত্তি বা কারণ ধরে নেয়াকে বুঝাচ্ছি। আর কিয়াস বলতে বুঝাচ্ছি, কোনো মানসূস বিধানের কারণ খুঁজে বের করা এবং সেই কারণের ভিত্তিতে অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও একই বিধান স্থির করা।

শাফেয়ী ফকীহদের এই কর্মপন্থাকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ইস্তেহসান বা রায়ের ভিত্তিতে কাজ করে, সে মূলত নিজেই শরীয়ত প্রণেতা (শারে') হতে চায়।" তাঁর এ বক্তব্যটি ইবনে হাজিব 'মুখতাসারুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এর উদাহরণ হচ্ছে ইয়াতীমের বুঝ-জ্ঞান হবার মাসআলা। আসলে ইয়াতীমদের বুঝ-জ্ঞান হওয়াটা এমন একটা গোপন বিষয় যার সময়-রেখা সকলের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ ভাবলেন, মানুষের তো পঁচিশ বছরের মধ্যে অবশ্যি বুঝ-জ্ঞান হয়ে যায়। সুতরাং তারা পঁচিশ বছরের এ ধারণা বা সম্ভাবনাকে 'বুঝ-জ্ঞান হওয়ার' বিকল্প হিসেবে ধরে নেন। এই ধারণা তাদের কাছে বিধানে পরিণত হয়ে যায় যে, ইয়াতীমের বয়স পঁচিশ বছর হলে তার মাল অবশ্যি তার কাছে ফেরত দিতে হবে। তাদের মতে এটা হচ্ছে 'ইস্তেহসান'। অথচ এ মাসআলায় কিয়াস হচ্ছে ইয়াতীমের মাল

৩০. অর্থাৎ আমাদেরই মতো তাঁরাও বুঝের ও চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রটি-বিচ্যুতির ঊর্ধে ছিলেন না। সুতরাং নবীর বক্তব্যের মতো তাঁদের বক্তব্যও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যায় না। কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসায়েল ইস্তেম্বাত করা তাঁদের জন্যে যেমন বৈধ ছিলো, আমাদের জন্যেও তেমনি বৈধ। সর্বাবস্থায় তাঁদের ইস্তিম্বাতের অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই। —অনুবাদক

ততোক্ষণ পর্যন্ত তার হাতে ফেরত (ছেড়ে) দেয়া যাবে না যতোক্ষণ না সে পুরোপুরি বুঝ-জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়।

মোটকথা, শাফেয়ী তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে যখন এই বিষয়গুলো দেখতে পেলেন, তখন তিনি ইল্‌মে ফিকাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নতুনভাবে দৃষ্টি আরোপ করেন এবং উসূলে ফিকাহ্‌র ভিত্তি স্থাপন করেন। অতপর সেই উসূলের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌র বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ইস্তেম্বাত করেন, গ্রন্থাবলী রচনা করেন এবং মুসলিম উম্মাহ্‌কে উপকৃত করেন। সমকালীন ফকীহ্‌রা তাঁর চারপাশে একত্রিত হয়ে যান। তাঁরা তাঁর চিন্তাধারা ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, সেগুলোর সার নির্যাস বের করেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, সেগুলো থেকে দলিল আদিল্লা গ্রহণ করেন এবং সেগুলোকে সামনে রেখে নতুন নতুন মাসায়েল ইস্তেম্বাত করেন। অতপর এসব জিনিস সাথে নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবেই ফিকাহ্‌র আরেকটি স্কুল, আরেকটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করে, যা শাফেয়ীর (রা) নামের সাথে সম্পৃক্ত।[৩১]

---

৩১. গ্রন্থকার এখানে হাম্বলী মাযহাবকে পৃথক মাযহাব হিসেবে উল্লেখ করেননি। সম্মুখে একস্থানে তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। –অনুবাদক

হাদীসের অনুসৃতি

জেনে রাখো, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইব্রাহীম নখয়ী এবং যুহ্‌রীর যামানায়, এরপর মালিক ও সুফিয়ান সওরীর যামানায়; এমনকি তাঁদের পরেও একদল আলিম সবসময় এমন ছিলেন, যাঁরা শরয়ী বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রায় প্রয়োগ করাকে কঠোরভাবে অপছন্দ করতেন। তাঁরা সাধারণত ফতোয়া প্রদান করতে এবং মাসআলা ইস্তিম্বাত করতে ভয় পেতেন। যেক্ষেত্রে ফতোয়া দান এবং ইস্তিম্বাত করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিলনা কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই তাঁরা ফতোয়া দিতেন এবং ইস্তিম্বাত করতেন। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীসের প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে সে সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করে দেয়াকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, "আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হারামকৃত কোনো জিনিস তোমার জন্যে হালাল করাকে এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হালালকৃত কোনো জিনিসকে তোমার জন্যে হারাম করাকে আমি সাংঘাতিক অপছন্দনীয় কাজ মনে করি।"[৩২]

মুয়ায ইবনে জাবাল বলেছেন, "বিপদ আসার আগে বিপদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ো না।[৩৩] কারণ প্রত্যেক যুগেই এমন মুসলিম মওজুদ থাকবে, যারা সমকালীন মাসায়েলের সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবে।" হযরত উমার (রা), আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইবনে মাসউদও একইভাবে সমস্যা সৃষ্টি হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন।

ইবনে উমার (রা) জাবির ইবনে ইয়াযিদকে বলেছিলেন, "তুমি বসরার ফকীহ্‌দের অন্যতম। সাবধান, যখনই কোনো ফতোয়া দেবে, তা দেবে স্পষ্টভাষী কুরআন কিংবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত দ্বারা। এর খেলাফ করলে তুমি নিজেও ধ্বংস হবে, অন্যদেরকেও ধ্বংস করবে।"

---

৩২. মানে, কোনো জিনিস বৈধ কি অবৈধ, কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে তা যতোক্ষণ না জানা যাবে, ততোক্ষণ কেবল নিজ রায়ের ভিত্তিতে সেটাকে বৈধ বা অবৈধ বলা যেতে পারেনা। কারণ এতে করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলে ফেলার আশংকা থেকে যায়। –অনুবাদক

৩৩. অর্থাৎ সমস্যা সৃষ্টি হবার আগেই সে সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করোনা। –অনুবাদক

আবুন নদর বলেছেন ঃ হযরত আবু সালামা যখন বস্‌রায় তাশরীফ এনেছিলেন, তখন আমি এবং হাসান বসরী তাঁর সম্মুখে হাজির হই। তিনি হাসান বসরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনিই কি হাসান? বস্‌রায় আপনার সাক্ষাত পাবার জন্যে আমি সবচাইতে বেশী উদগ্রীব ছিলাম। এর কারণ হলো, আমি শুনতে পেয়েছি, আপনি নাকি স্বীয় 'রায়' দ্বারা ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এমনটি করবেন না। ফতোয়া কেবল রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সুন্নাহ কিংবা আল্লাহ্‌র, অবতীর্ণ কিতাব দ্বারা দেবেন।"

ইবনুল মুনকাদির বলেছেন, "আলিম ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মাঝখানে অবস্থান করে। সুতরাং এ নাজুক অবস্থা থেকে নিরাপদে বেরুবার পথ অন্বেষণ করা তার উচিত।"

শা'বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনাদের, কাছে লোকেরা ফতোয়া চাইলে আপনারা কি করতেন?" জবাবে তিনি বললেন, "খুবই বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন! আমাদের কারো নিকট ফতোয়া চাওয়া হলে, সাথীদের কাউকে **বলতাম** ঃ ফতোয়াটা দিয়ে দিন। তিনি আবার দায়িত্বটা অপর কারো কাছে হস্তান্তর করতেন। এভাবে দায়িত্ব পরিবর্তন হতে হতে পুনরায় সেই প্রথম ব্যক্তির ঘাড়েই এসে দায়িত্ব চাপতো।" ইমাম শা'বীর আরেকটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "ফতোয়াদানকারীরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পক্ষ থেকে তোমাকে যা কিছু শুনাবে, তা-ই গ্রহণ করবে কিন্তু স্বীয় রায় দ্বারা যদি কিছু বলে, তবে তা পায়খানায় নিক্ষেপ করবে।"[৩৪]

হাদীস সংকলনের যুগ

এইসব কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী সাম্রাজ্যে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আছার সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। এমনকি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সম্ভবত এমন লোক খুব কমই ছিলেন, যার নিকট কমপক্ষে হাদীসের একটি সংকলন, পুস্তিকা কিংবা গ্রন্থ ছিলনা। এ যুগের সেরা মুহাদ্দীসগণ হিজাজ, সিরিয়া, মিসর, ইয়েমেন.

---

৩৪. এইসব ঘটনা দারেমীর সূত্রে উদ্ধৃত হলো। –গ্রন্থকার

৩৫. গরীব হাদীস হচ্ছে সেই হাদীস যা কেবলমাত্র একজন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে পাওয়া গেছে। –অনুবাদক

খোরাসান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তাঁরা তৎকালীন গোটা মুসলিম বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে লোকদের কাছ থেকে তাদের সংগৃহীত হাদীসের কিতাব, সংকলন ও পুস্তিকাসমূহ সংগ্রহ করেন। তাঁরা এই কষ্টসাধ্য কাজ এতোটা নিখুঁতভাবে করেছেন যে, গরীব হাদীস[৩৫] এবং দুর্লভ আছারসমূহ, পর্যন্ত খুঁজে বের করেছেন। এমনি করে এই লোকদের প্রচেষ্টায় হাদীস ও আছারের এতোটা বিরাট ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়ে যায়, যতোটা ইতিপূর্বের সকল যুগ মিলিয়েও সম্ভব হয়নি। এভাবে একত্রে সকল বিষয়ের হাদীস ও আছার জানা এই সময়ের লোকদের জন্যে যতোটা সহজ হয়ে যায়, তা তাদের পূর্বেকার লোকদের জন্যে ততোটা সহজ ছিলনা। এদের কাছে একেকটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে (সনদ) এসে পৌঁছেছে। এমনকি কোনো কোনো হাদীসের সনদ সংখ্যা একশ' পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। সনদ সংখ্যা একশতের বেশী, এমন হাদীসও পাওয়া গেছে। একেকটি হাদীস বহু সনদের মাধ্যমে পাওয়া যাবার ফলে অনেক উপকার হয়েছে। যেমন ঃ

১. কোনো সনদে একটি হাদীসের কিছু অংশ ছাড় পড়ে গিয়ে থাকলে অন্য সনদে তা বর্ণিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

২. গরীব ও মশহুর[৩৬] হাদীস চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে।

৩. এর ফলে এ সময়কার আলিমদের জন্যে হাদীসের 'শাহিদ' এবং 'মুতাবি'[৩৭] সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে।

৪. এর ফলে এ সময়কার আলিমদের নিকট এমনসব সহীহ হাদীস প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যেগুলো তাঁদের পূর্বেকার ফতোয়া দানকারীদের জানাই ছিল না। ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদকে বলেছিলেন ঃ আপনারা সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমাদের চাইতে অধিকতর জ্ঞান রাখেন। আপনার জানা যে কোনো সহীহ

---

৩৬. মশহুর সেই হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীস সাহাবী এবং তাবেয়ীদের যুগে খুব প্রচারিত না হলেও পরবর্তীকালে কোনো বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। –অনুবাদক

৩৭. 'শাহিদ' মানে সাক্ষী বা সমর্থক। ঐ হাদীসগুলো একটি আরেকটির শাহিদ যেগুলোর বিষয়বস্তু একটিই, কিন্তু বিভিন্ন রাবী বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।
'মুতাবি' মানে অধীন বা অনুসারী। ঐ হাদীসগুলো একটি আরেকটির 'মুতাবি' যেগুলোর বিষয়বস্তু এক এবং একজনমাত্র সাহাবী থেকে বিভিন্ন রাবী সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে। –অনুবাদক

হাদীস সম্পর্কে আমাকে অবগত করবেন, চাই সে হাদীস কুফার লোকদের বর্ণিত হোক কিংবা বস্‌রার লোকদের বর্ণিত হোক কিংবা হোক সিরিয়ার লোকদের বর্ণিত।[৩৮]

অনেকগুলো হাদীস যে কিছুলোক জানতেন আবার কিছুলোক জানতেন না, তার কয়েকটি কারণ ছিলো। সেগুলো হলো ঃ

১. অনেক হাদীস এমন ছিলো, যেগুলোর বর্ণনাকারীরা কেবল কোনো একটি বিশেষ স্থানের অধিবাসী ছিলেন। যেমন, সেসব হাদীস, যেগুলো শুধু সিরিয়া কিংবা ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করেছে।

২. অনেকগুলো হাদীস এমন ছিলো যেগুলো কোনো বিশেষ খানদানের লোকদের হাতে আবদ্ধ ছিলো। যেমন, 'নুসখায়ে বুরাইদা' নামক হাদীস সমষ্টি। এ হাদীসগুলো বরীদ আবু বারদা থেকে এবং আবু বারদা আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে 'নুসখায়ে আমর ইবনে শুয়াইব'। এ নুসখার হাদীসগুলোর বর্ণনাকারী শুধুমাত্র আমর ইবনে শুয়াইব। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদার কাছ থেকে শুনে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।

৩. এমন কিছু হাদীস ছিলো, যেগুলোর বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন অখ্যাত অপরিচিত। এরূপ লোকদের হাদীসও কম জানা ছিলো এবং বর্ণনাও করেছেন কম। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের থেকে খুব কম লোকই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এই ধরনের হাদীসগুলো সাধারণ ফতোয়া দানকারী লোকদের নিকট ছিলো অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এ যুগের আলিমদের নিকট গোটা হাদীসের ভাণ্ডার তো পৌঁছেছেই, সেইসাথে প্রতিটি জনপদে বসবাসকারী সাহাবী এবং তাবেয়ী ফকীহ্‌দের আছার পর্যন্ত তাদের নিকট পৌঁছে যায়। অথচ এ যুগের পূর্বেকার যেকোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র সেইসব হাদীসই সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিলো, যেগুলো শুধুমাত্র তার শহরের লোকদের এবং তাঁর উস্তাদদের মাধ্যমে তাঁর নিকট পৌঁছেছে। এর পূর্বে রাবীদের নাম এবং তাঁদের আদালতগত[৩৯] মর্যাদা নির্ণয়

---

৩৮. ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনুল হুমাম। –গ্রন্থকার।

৩৯. 'আদালত' হাদীসের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হলো হাদীস বর্ণনাকারীর সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন বালিগ মুসলমান হওয়া, ফিস্‌ক ও লজ্জাহীনতার ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া এবং বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় সৃষ্টি হতে পারে এরূপ কার্যকলাপ থেকে মুক্ত

(অপর পৃষ্ঠায়)

করা হতো রাবীর অবস্থা ও পরিবেশের ভিত্তিতে সাধারণ মানবিক দৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুগে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা পর্যালোচনার মাধ্যমে এটাকে একটা পৃথক 'বিষয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পুংখানুপুংখ যাচাই বাছাইর মাধ্যমে প্রত্যেক রাবীর ভালমন্দ সকল দিক নির্ণয় করা হয়েছে। এবং এ বিষয়ে বলিষ্ঠ গ্রন্থাবলী রচনা করা হয়েছে। এই বিচার বিশ্লেষণ ও গ্রন্থরচনার ফলে হাদীসসমূহের মুত্তাসিল এবং মুনকাতি হবার বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, কোন্ হাদীসটি মুত্তাসিল আর কোন্‌টি মুনকাতি।[৪০] সুফিয়ান সওরী, ওকী এবং তাদের সমপর্যায়ের লোকেরা তো চূড়ান্ত পর্যায়ের ইজতিহাদ করেছিলেন, কিন্তু তারপরও এক হাজার মুত্তাসিল মারফু হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে আবু দাউদ সিজিস্তানীর লেখা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়। অথচ এই স্তরের লোকদের বর্ণিত হাদীসসংখ্যা চল্লিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। (অবশ্য এই সংখ্যা এর চাইতে অনেকগুণ বেশী। কিন্তু বাকীগুলো তাঁরা হাদীস যাচাইয়ের কষ্টি পাথরে নিরীক্ষণ করে পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন)। ইমাম বুখারী থেকে তো একথা বিশুদ্ধভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, ছয় লাখ হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই করে তিনি 'সহীহ বুখারী' সংকলন করেছেন। আবু দাউদ-সিজিস্তানী থেকে বর্ণিত হয়েছে, পাঁচ লক্ষ হাদীস যাচাই বাছাই করে তিনি 'সুনানে আবু দাউদ' সংকলন করেছেন। আহমদ ইবনে হাম্বল তো তাঁর 'মুসনাদ'কে এমন এক মানদণ্ড হিসেবে সংকলন করেছেন, যার ভিত্তিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যেতে পারে। যদিও তাঁর সংকলিত হাদীসগুলো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবু তাঁর মুসনাদ এমন এক মানদণ্ড যে, অন্য কারো বর্ণিত হাদীস যদি তাঁর গ্রন্থে বর্তমান থাকে, তবে বলা যায়, হাদীসটির ভিত্তি রয়েছে আর যদি তাঁর গ্রন্থে হাদীসটি না থাকে তবে বলা যেতে পারে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

থাকা। –অনুবাদক

৪০. যে হাদীসের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং কোনো পর্যায়ে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য থাকেনি, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে। আর যে হাদীসে বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকেনি, এবং মাঝখান থেকে কোন রাবী উহ্য থেকে গেছে বা বাদ পড়ে গেছে, তাকে মুন্‌কাতি' হাদীস বলে। –অনুবাদক

হাদীস বিশারদগণের ফিকাহ্‌র প্রতি মনোযোগ

এসময় আরো যারা হাদীস শাস্ত্রে অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ছিলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ কাতান, ইয়াযীদ ইবনে হারূন, আবদুর রাযযাক, আবু বকর ইবনে আবী শাইবা, মুসাদ্দাদ, হান্নাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহুইয়া, ফদল ইবনে দুকাইন, আলী ইবনে আলমাদানী এবং তাঁদের সমপর্যায়ের আরো কতিপয় মুহাদ্দিস। এটা হাদীস বিশারদগণের সেই তবকা, যা ছিলো সকল তবকার চাইতে সেরা। গবেষণা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীসশাস্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর এ শাস্ত্রের মুহাক্কিকগণ ফিকাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁদের পূর্বেকার ফিকাহ্‌র ইমামদের কোনো একজনের তাকলীদ করার ব্যাপারে একমত হওয়া তাদের জন্যে সম্ভব হয়নি। কারণ, তাঁরা দেখলেন, প্রত্যেকটি মাযহাবেই এমন অনেক মতামত রয়েছে যা বহুসংখ্যক হাদীস এবং আছারের[৪১] সাথে সাংঘর্ষিক। তাই তারা কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেন এবং তার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদদের আছার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক বিধান অবগত হয়ে তার উপর আমল করেন। তাঁদের প্রণীত মূলনীতিগুলো (উসূল) সংক্ষেপে আমি তোমার সম্মুখে পেশ করছি।

নতুন উসূলে ফিকাহ

তাঁদের মূলনীতিগুলো ছিলো এই যে ঃ

১. কোনো বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া গেলে, সে বিষয়ে অন্য কিছুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা বৈধ নয়।

২. কোনো বিষয়ে যদি কুরআনের বক্তব্যের একাধিক অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকে, তবে সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতে রাসূল দ্বারা সে বিষয়ের ফায়সালা গ্রহণ করতে হবে।

৩. যে মাসআলায় কুরআন থেকে কোনো ফায়সালা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে তাঁরা হাদীসে রাসূলকে আঁকড়ে ধরেছেন। সে হাদীস সকল ফকীহ্‌র নিকট

৪১. সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ, সমর্থন ও মতামতকে 'আছার' বলা হয়। –অনুবাদক

গ্রহণযোগ্য ছিল কি ছিলনা সেদিকে তাঁরা নজর দেননি কিংবা হাদীসটি কোনো বিশেষ শহর বা খান্দানের সূত্রেই বর্ণিত হয়ে আসুকনা কেন, তাতেও তাঁরা কোনো প্রকার দোষ মনে করেননি। হাদীসটির উপর সকল সাহাবী এবং ফকীহ আমল করেছেন কি করেননি, তাও তাঁরা দেখেননি। মোটকথা, কোনো হাদীস পাওয়া গেলে তার সম্মুখে তারা কোনো ইজতিহাদকে গুরুত্ব দিতেন না।

৪. কোনো মাসআলা সম্পর্কে চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্বেষণের পরও যদি কোনো হাদীস না পেতেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁরা বিরাট সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর মতামতের অনুসরণ করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্ববর্তী ফকীহদের নীতি অনুসরণ করতেন না। এরূপ অবস্থায় পূর্ববর্তী ফকীহগণের অনুসৃত নীতি ছিলো এই যে, তাঁরা সকল সাহাবী ও তাবেয়ীর মতামতের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র বিশেষ সংখ্যক বা বিশেষ শহরের আলিমগণের মতামত অনুসরণ করতেন। এঁরা নিজেদেরকে অনুরূপ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ করেননি। বরঞ্চ এঁদের নিয়ম এই ছিলো যে, কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মশহুর ফকীহগণকে একমত দেখতে পেলে তাঁরা নির্দ্বিধায় তা অনুসরণীয় মনে করতেন। কিন্তু যদি তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য পেতেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা ঐ ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিতেন যিনি তাঁদের মধ্যে ইল্‌ম, খোদাভীতি ও স্মরণশক্তির দিক থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন। অথবা ঐ মতটি গ্রহণ করতেন যেটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। তাছাড়া কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে যদি সমান গুরুত্বপূর্ণ দুটি মত পেতেন, তবে সেটিকে তাঁরা "দুই মতওয়ালা মাসআলা" বলতেন।[৪২]

৫. চতুর্থ পন্থায়ও যদি কোনো মাসআলার সমাধান পেতে ব্যর্থ হতেন, তখন তাঁরা আয়াতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাধারণ অর্থ, ভাবগত ইংগিত ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন এবং এ সংক্রান্ত পূর্ব দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করতেন আর দৃষ্টান্তকে অবশ্যি মাসআলাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হতো। এভাবেই উপনীত হতেন তাঁরা কোনো একটি সমাধানে। এক্ষেত্রেও তাঁরা কোনো একটি ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন ছিলেন না। বরঞ্চ সেই সমাধানটিই তাঁরা গ্রহণ করতেন, যেটির প্রতি তাদের জ্ঞানবুদ্ধি আস্থাশীল হতো এবং মন হতো আশ্বস্ত। ব্যাপারটি ঠিক তেমন, যেমন কোনো হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলে

৪২. এক্ষেত্রে দুটি মতই তাঁদের নিকট সমানভাবে অনুসরণযোগ্য ছিলো। –অনুবাদক

নির্ণয় করাটা হাদীসটির রাবীসংখ্যা এবং বারীদের আদালতের ধরনের উপর নির্ভর করতোনা, বরঞ্চ লোকদের মনের নিষ্ঠাগত ইয়াকীন যেদিকে সায় দিতো তার ভিত্তিতে হাদীসটির বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নির্ণয় করা হতো। সাহাবীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা বিষয়টি উল্লেখ করে এসেছি।

উসূলগুলোর উৎস

হাদীস বিশারদগণের এই উসূলগুলোর উৎস ছিলো তাঁদের পূর্ববর্তীদের কার্যক্রম ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে মাইমুন ইবনে মিহ্রান বলেন ঃ

"আবু বকরের (রা) সামনে কোনো বিবাদের মীমাংসার জন্যে মুকদ্দমা পেশ করা হলে তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। তাতে যদি বিষয়টি সংক্রান্ত বিধান পেয়ে যেতেন, তাই দিয়েই ফায়সালা করতেন। **কিতাবুল্লায়** সে সংক্রান্ত কোনো বিধান পাওয়া না গেলে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ তাঁর জানা থাকলে তাই দিয়ে ফায়সালা করতেন। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো **সুন্নাহ বা হাদীস** নিজের জানা না থাকলে বেরিয়ে পড়তেন এবং মুসলমানদের মধ্যে কারো জানা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। বলতেন ঃ আমার কাছে এরূপ এরূপ একটি মুকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, অনুরূপ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কোনো ফায়সালা তোমাদের জানা আছে কি? এমতাবস্থায় সাধারণত তাঁর সামনে একদল লোক জমা হয়ে যেতো। তাঁদের প্রত্যেকেই অনুরূপ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর ফায়সালার ঘটনা তাঁকে শুনাতেন। তখন আবু বকর বলতেন ঃ 'শোকর সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের মধ্যে এমনসব লোক সৃষ্টি করেছেন যাঁরা আমাদের জন্যে আমাদের নবীর বাণী সংরক্ষণ করে রেখেছেন।' সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার পরও সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র কোন সুন্নাহ[৪৩] উদ্ধার করতে না পারলে সাহাবীদের মধ্যকার সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী লোকদের ইজতেমা করতেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইতেন। অতপর কোনো একটি রায়ের উপর তাঁদের মতৈক্য হলে তিনি সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে দিতেন।"

একইভাবে হযরত উমার (রা) সম্পর্কে কাযী শুরাইহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শুরাইহ্‌কে ফরমান পাঠিয়েছিলেন ঃ

---

৪৩. এ গ্রন্থে 'সুন্নাহ' শব্দটি 'হাদীসে রাসূল' ও 'সুন্নাতে রাসূল' উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। —অনুবাদক

"আপনার কাছে যদি এমন কোনো বিষয় উপস্থাপিত হয়, যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে মওজুদ রয়েছে, তবে সে অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। মানুষের মতামত যেনো আপনাকে আল্লাহ্র কিতাব থেকে অন্যদিকে ফেরাতে না পারে। এমন কোনো মুকদ্দমা যদি আপনার সামনে পেশ করা হয়, যার কোনো বিধান আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তবে সে বিষয়ে সুন্নাতে রাসূলের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করুন এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা করুন। এমন কোনো বিষয় যদি আপনার সামনে পেশ হয় যার কোনো বিধান কিতাবুল্লাহতেও নেই এবং সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাহও নীরব, তবে সে বিষয়ে লোকদের সাধারণ ও সর্বসম্মত মত কি তা দেখুন এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা করুন। আর আপনার নিকট যদি এমন কোনো মুকদ্দমা উপস্থিত হয় যে সম্পর্কে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলে তো কোনো বিধান নেই-ই, এমনকি আপনার পূর্ববর্তীদেরও কেউই সে সম্পর্কে কোনো মতামত দিয়ে যাননি, তবে সে সম্পর্কে আপনি দুটি পন্থার যে কোনোটি অবলম্বন করতে পারেন। (এক) নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে সাথে সাথে কোনো ফায়সালা প্রদান করতে পারেন। কিংবা (দুই) ইজতিহাদী রায কার্যকর করার বিষয়টি বিলম্ব করতে পারেন এবং বিষয়টি নিয়ে আরো অধিকতর চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। আর এ শেষোক্ত জিনিসটি (বিলম্ব করা) আমি আপনার জন্যে উত্তম মনে করি।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ

"আমাদের জীবনে এমন একটি সময়[৪৪] অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোনো ফায়সালা প্রদান করতাম না এবং তার উপযুক্তও আমরা ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী সেইস্থানে উপনীত হয়েছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। শোনো, আজকের পর যার সামনেই কোনো মুকদ্দমা উপস্থিত হয়, সে যেনো অবশ্যি আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে ফায়সালা করে। এমন কোনো বিষয় যদি তার সামনে পেশ হয় যে সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবে কোনো বিধান নেই, তবে সে যেনো রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করে! কিন্তু যখন এমন কোনো বিষয় তার সামনে উপস্থিত হবে যে সম্পর্কে কোন বিধান কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূল উভয়টি থেকেই পাওয়া না যাবে, তখন যেনো সে উক্ত বিষয়ে সালিহ লোকদের ফায়সালার ভিত্তিতে ফায়সালা করে। এক্ষেত্রে সে যেনো এমনটি না বলে যে, আমি ভয় পাচ্ছি কিংবা

---

৪৪. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা। –অনুবাদক

আমার মত এটা। কেননা হারাম সুস্পষ্ট এবং হালালও সুস্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝখানে এমন কিছু জিনিস আছে, যেগুলোর হারাম হওয়াও স্পষ্ট নয় এবং হালাল হওয়াও স্পষ্ট নয়। সুতরাং অস্পষ্ট জিনিসগুলোর ব্যাপারে এই নীতি অবলম্বন করো যে, তোমার মনে যে জিনিস সম্পর্কে খটকা লাগে তা ত্যাগ করো আর যে সম্পর্কে মন নিশ্চিন্ত হয়, তা গ্রহণ করো।"

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যখন কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হতো, তিনি কুরআনের বিধান মুতাবিক তার জবাব দিতেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্‌র কিতাবে পাওয়া না গেলে রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ মুতাবিক তার জবাব দিতেন। কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল কোনোটিতেই যদি তার জবাব খুঁজে না পেতেন, তবে আবুবকর এবং উমারের (রা) ফায়সালার ভিত্তিতে জবাব দিতেন। কিন্তু যখন তাঁদের থেকেও অনুরূপ কোনো ফায়সালার দৃষ্টান্ত পাওয়া না যেতো, তখন ইজতিহাদ করে নিজ রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতেন।

এই ইবনে আব্বাসই (রা) এক ভাষণে লোকদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ

"তোমরা যে বলো, 'রাসূলুল্লাহ একথা বলেছেন আর অমুক একথা বলেছেন'—এ ব্যাপারে তোমাদের কি এই ভয় নেই যে, তোমাদেরকে কঠিন আযাব গ্রাস করবে কিংবা জমীন তলিয়ে নেবে!"

কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ ইবনে সীরীন কোনো এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) একটি হাদীস শুনালে সে বললো ঃ "এই মাসআলাটি সম্পর্কে অমুক ব্যক্তি এরূপ বলেছে।" ইবনে সীরীন জবাব দিলেন, "আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীস শুনালাম, আর তুমি বলছো, অমুক ব্যক্তি এরূপ বলেছে?"

আওযায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার ইবনে আবদুল আযীয লিখিত ফরমান জারি করেন যে, "কিতাবুল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে কোনো ব্যক্তির রায়ের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের রায় কেবলমাত্র ঐসব ক্ষেত্রেই বিবেচ্য হবে, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূলের বিধান অনুপস্থিত। যেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কোনো সুন্নাহ রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কোনো রায় প্রদানের অধিকার কারো নেই।"

আ'মাশ বলেন ঃ ইব্রাহীম নখয়ী একক মুক্তাদীকে ইমামের বাম পাশে দাঁড়াতে বলতেন। আমি তাঁকে সামী' যাইয়্যাতের সূত্রে ইবনে আব্বাস বর্ণিত

এই হাদীসটি শুনালাম, "রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন।"[৪৫] হাদীসটি শুনার সাথে সাথে ইব্রাহীম নখয়ী তা গ্রহণ করেন এবং নিজের ধারণা পরিবর্তন করেন।

শা'বী থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে কোনো একটি বিষয়ে জানতে আসে। তিনি বলে দিলেন, এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ এরূপ বলেছেন। লোকটি বললো "বিষয়টি সম্পর্কে আপনার রায় কি?" তিনি বললেন, "হে লোকেরা এই লোকটির কথা তোমাদের বিস্মিত করছেনা! আমি তাকে ইবনে মাসউদের সূত্রে জবাব দিয়ে দিয়েছি, অথচ সে আমার নিজের রায় জানতে চাচ্ছে! আমি তাকে যে জবাব দিয়েছি, জবাব দেবার এই তরীকাই আমার কাছে সর্বোত্তম। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে আমি যার সূত্রে জবাব দিয়েছি, তার পরিবর্তে আমার নিজের রায় প্রদান করার চাইতে কোনো গান গাওয়াকে[৪৬] আমি অধিক পছন্দ করি।"[৪৭]

তিরমিযী আবু সায়িবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা ওকীর নিকট বসা ছিলাম। রায় দ্বারা কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী এক ব্যক্তিকে তিনি বলছিলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর উটের কুঁজে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। অথচ আবু হানীফা এটাকে বলেছেন, নাক কান কর্তিত করা!" লোকটি বললো ঃ "এর কারণ, ইব্রাহীম নখয়ী এটাকে নাক কান কর্তিত করা বলেছেন।" তার এ বক্তব্য শুনে ওকী ভীষণভাবে রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ "আমি তোমাকে বলছি রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলেছেন! অথচ তুমি বলছো, ইব্রাহীম ঐরূপ বলেছে! তোমাকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখা উচিত এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে মুক্ত করা উচিত নয়, যতোক্ষণ না তুমি তোমার এরূপ চিন্তা ও বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তন করো।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ এবং মালিক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত এমন কোনো মানুষ নেই যার কথার কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য এবং কিছু অংশ বর্জনযোগ্য হয় না।"

---

৪৫. একবার তাহাজ্জুদ নামাযে ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর বাম পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পিছে ইকতিদা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ধরে এনে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। –অনুবাদক

৪৬. 'গান গাওয়া' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, মুখ থেকে কোনো গুনাহ্‌র উপযুক্ত কথা বেরিয়ে পড়া। –অনুবাদক

৪৭. উপরোল্লেখিত সবগুলো ঘটনা ও বক্তব্য দারেমীর সূত্রে উদ্ধৃত হলো। –গ্রন্থকার

ফিকাহ্‌র এই পদ্ধতির সাফল্য

মোটকথা, হাদীসের আলিমগণ মাসআলা ইস্তিম্বাত করার জন্যে যখন উসূলে ফিকাহ্‌কে এই নতুন বুনিয়াদের ভিত্তিতে সাজালেন, তখন আর তাঁদের পূর্ববর্তীদের আলোচিত কিংবা তাদের নিজেদের সময়ে সংঘটিত এমন কোন মাসআলা অবশিষ্ট থাকলো না যেটি সম্পর্কে কোনো না কোনো মারফু মুত্তাসিল বা মুরসাল কিংবা মওকূফ অথচ সহীহ্, হাসান এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস পাওয়া যায়নি। কদাচিত কোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো হাদীস পাওয়া না গেলেও অন্তত শায়খাইন[৪৮] ও অন্যান্য খলীফার আছার, বিভিন্ন শহরের কাযীদের রায় অথবা ফকীহ্‌গণের কোনো ফতোয়া অবশ্যি পেয়েছেন কিংবা নস্‌সে সরীহ্‌র উমুম, ইংগিত ও উপযোগিতার ভিত্তিতে সরাসরি ইস্তিম্বাত করে নিয়েছেন। এভাবেই সত্যিকার সুন্নাতে রাসূলের রাজপথ অনুসরণের কাজ আল্লাহতায়ালা তাঁদের জন্যে সহজ করে দেন। এই আলিমগণের মধ্যে পূর্ণত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, হাদীসের বিন্যাস জ্ঞান ও বর্ণনার দিক থেকে উচ্চতা ও আধিক্য এবং গভীরতম ফকীহ্‌সুলভ জ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করছিলেন আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহুইয়া।

ফিকাহ্‌র এই তরীকা অনুশীলনের জন্যে প্রয়োজন বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের। এ পন্থায় শরয়ী বিধান সম্পর্কে রায় কায়েম করার জন্যে ব্যক্তির ভাণ্ডারে হাদীস ও আছারের বিরাট সঞ্চয় বর্তমান থাকা আবশ্যক। আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "এক লাখ হাদীস জানা থাকা মুফতী হবার জন্যে যথেষ্ট নয় কি?" তিনি বললেন, 'নয়'। অতপর প্রশ্নকর্তা হাদীসের সংখ্যা বাড়াতে থাকে আর তিনি 'নয়' বলতে থাকেন। অবশেষে প্রশ্নকর্তা বললেন "পাঁচ লাখ হাদীস জানা থাকলে?" এবার তিনি বললেন "হ্যাঁ, আশা করা যেতে পারে।"[৪৯] এখানে ইমাম আহমদ উপরোল্লেখিত মূলনীতির (উসূলে ফিকাহ) ভিত্তিতে ফতোয়া দান বুঝিয়েছেন।

হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণের যুগ

৪৮. অর্থাৎ আবুবকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। –অনুবাদক

৪৯. ঘটনাটি 'গায়াতুল মুনতাহা' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। –গ্রন্থকার

অতপর আল্লাহ তায়ালা আরেকদল লোক সৃষ্টি করলেন। এরা দেখলেন, তাঁদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও (উপরোল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে) উসূলে ফিকাহ্র বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে তাঁদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী করে গেছেন। সুতরাং এরা হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য দিকের প্রতি মনোনিবেশ করেন। যেমন, তাঁরা সেসব সহীহ হাদীসকে পৃথক করেন, যেগুলো সহীহ্ হবার ব্যাপারে ইয়াযীদ ইবনে হারুন, ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদুল কাতান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহুইয়া এবং তাঁদের সমপর্যায়ের সেরা হাদীস বিশারদগণ একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা ঐসব ফিক্হী হাদীসকে বেছে বেছে পৃথক করেন, যেগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন শহরের ফকীহ ও আলিমগণ নিজ নিজ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা ঐসব শায[৫০] ও গরীব হাদীসের উপর অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে সেগুলোর মর্যাদা ও হুকুম বর্ণনা করেন, অতীতের আলিমগণ যেগুলো উপেক্ষা করে এসেছেন। এর প্রত্যেকটি হাদীসের সনদগত ও বিধানগত মর্যাদা বর্ণনা করেন। তাঁরা সেইসব সনদও অনুসন্ধান করে বের করেন, তাঁদের পূর্বের হাদীস সংগ্রহকারীগণ যেসব সনদের মাধ্যমে হাদীস সংগ্রহ করতে পারেননি, অথচ সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সনদগুলো উদ্ধার করার ফলে দেখা গেলো, কোনোটি মুত্তাসিল, কোনোটি উঁচুস্তরের রাবী কর্তৃক বর্ণিত, কোনোটি ফকীহ থেকে ফকীহ্ কর্তৃক বর্ণিত এবং কোনোটি হাফিযে হাদীস রাবী থেকে হাফিযে হাদীস রাবী কর্তৃক বর্ণিত। এভাবে সেগুলো থেকে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটিত হয়।

হাদীসের এই মহান খাদিমদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আব্দ ইবনে হুমাইদ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, আবু ইয়ালী, তিরমিযী, নাসায়ী, দারুকুতনী, হাকিম, বায়হাকী, খতীব, দায়লামী, ইবনে আবদুল বার এবং এঁদের সমপর্যায়ের অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ।

এই মনীষীগণের মধ্যে আবার আমার মতে জ্ঞান, গ্রন্থরচনা এবং খ্যাতির দিক থেকে শীর্ষচূড়ায় অবস্থানকারী ছিলেন চারজন। চারজনই প্রায় সম-সাময়িককালের লোক ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ

এক. আবু আবদুল্লাহ আল বুখারী ঃ এ চারজনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন

---

৫০. 'শায' হচ্ছে সেই হাদীস যার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বটে, কিন্তু হাদীসটি তার চাইতে অধিকতর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীসের বিপরীত। –অনুবাদক

আবু আবদুল্লাহ আল বুখারী। তাঁর দৃষ্টিভংগি ছিলো এই যে, মুত্তাসিল, মশহুর ও সহীহ্ হাদীসসমূহকে অন্য ধরনের হাদীসসমূহ থেকে ছেঁটে বেছে পৃথক করতে হবে এবং এগুলোরই উপর ফিকাহ্, সীরাত এবং তাফসীরের ভিত্তি স্থাপন করে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করতে হবে। এই দৃষ্টিভংগিতেই তিনি সংকলন করেন তাঁর চির অম্লান গ্রন্থ ' জামিউস্ সহীহ' (আল বুখারী)। এ গ্রন্থে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত শর্তসমূহ তিনি পুরোপুরি রক্ষা করেন।

শুনেছি, জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলছেন, "তোমার কি হলো যে, তুমি আমার কিতাব পরিত্যাগ করে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীসের[৫১] ফিকাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করেছো?" বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কিতাব কোন্টি?" রাসূলুল্লাহ্ জবাব দিলেন, "সহীহ্ আল বুখারী।"

আল্লাহ্র কসম, এই গ্রন্থ খ্যাতি এবং গ্রহণযোগ্যতার এমন শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছেছে, যার চাইতে অধিক আশা করা যায় না।

দুই. মুসলিম নিশাপুরী ঃ এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন, মুসলিম নিশাপুরী। তাঁর আকাঙ্খা ছিলো এই যে, যেসব মুত্তাসিল মারুফু হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং যেগুলো দ্বারা সুন্নাতে রাসূলকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সহজ হবে, সেইসব হাদীসকে নির্বাচিত করে আলাদা করতে হবে। এই হাদীসগুলোকে তিনি এমন এক পদ্ধতিতে সংকলন করার সিদ্ধান্ত নেন, যার ফলে সেগুলো মস্তিষ্কে ধারণের উপযোগী হবে এবং সেগুলো থেকে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করা সহজ হবে।

অতপর তিনি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অতি উত্তম তরতীবের সাথে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি হাদীসের সবগুলো সনদ একস্থানে একত্র করেন, যাতে করে একই হাদীসের মতনের[৫২] বিভিন্নতা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং একই মূলসূত্র থেকে সনদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাও জানা যায়। বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য ছিলো, তিনি সেগুলোর মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করেন। এভাবে তিনি

৫১. অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর (র)। –অনুবাদক

৫২. প্রত্যেক হাদীসের দুইটি মৌলিক অংশ থাকে। একটি হলো বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। অপরটি হলো মূল বক্তব্য বা হাদীস অংশ। হাদীসের পরিভাষায় প্রথম অংশকে 'সনদ' এবং শেষাংশকে 'মতন' বলা হয়। –অনুবাদক

তাঁর এই মহান প্রচেষ্টার মাধ্যমে (অর্থাৎ সহীহ মুসলিম সংকলনের মাধ্যমে) একজন আরবী জানা ব্যক্তির জন্যে সুন্নাতে রাসূলের রাজপথ ত্যাগ করে অন্য কোনো দিকে ধাবিত হবার পক্ষে কোনো ওজর বাকী রাখেননি।

তিন. আবু দাউদ সিজিস্তানী ঃ এই চার মনীষীর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন, আবু দাউদ সিজিস্তানী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সেই হাদীসগুলোকে বাছাই করে পৃথক করা, যেগুলোকে ফকীহগণ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যেই অধিক খ্যাতি লাভ করেছে আর সেসব হাদীস, বিভিন্ন শহরের আলিমগণ যেগুলোর উপর আহকামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সংকলন করেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'সুনানে আবু দাউদ'। এ গ্রন্থে সহীহ এবং হাসান হাদীসের সাথে এমনসব দুর্বল (জয়ীফ) হাদীসও তিনি সংকলন করে নেন, যেগুলো দুর্বল হওয়া সত্বেও আমলের উপযোগী। আবু দাউদ নিজেই বলেছেন, "আমার গ্রন্থে আমি এমন কোনো হাদীস সংকলন করিনি, যেটি সকল মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য। আমার গ্রন্থে সংকলিত জয়ীফ হাদীসের জয়ীফ হবার ব্যাখ্যাও প্রদান করেছি। কোনো হাদীসে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি (ইল্লত) থেকে থাকলে তাও এমনভাবে বয়ান করে দিয়েছি যে কোনো হাদীস বিশারদের পক্ষে তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হবেনা।" তাঁর গ্রন্থের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রত্যেকটি হাদীস বর্ণনার পূর্বে এমন একটি ফিকহী বিধানকে সেটির শিরোনাম ধার্য করেছেন, যা অবশ্যি কোনো ফকীহ ইস্তিম্বাত করেছেন কিংবা কারো না কারো মাযহাবে পরিণত হয়েছে। এ কারণে আল গাযালী প্রমুখের মতে, 'মুজতাহিদের জন্যে সুনানে আবু দাউদ যথেষ্ট।'

চার. আবু ঈসা তিরমিযী ঃ এ মনীষীদের চতুর্থ ব্যক্তি হলেন আবু ঈসা তিরমিযী। বুঝা যাচ্ছে, তিনি একদিকে রেওয়ায়েতের পদ্ধতিগত দিক থেকে শায়খাইনকে[৫৩] অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে, ফকীহ ও আলিমদের মত ও মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু দাউদের পন্থা অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁর গ্রন্থে সাহাবী, তাবেয়ী এবং ফকীহদের মাযহাবও বর্ণনা করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি এমন এক মৌলিক ও পূর্ণাংগ (জামে) গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে ঃ

ক. সংক্ষিপ্তাকারে অতিশয় বিজ্ঞতার সাথে একেকটি হাদীসের সবগুলো সনদ

---

৫৩. হাদীস শাস্ত্রে 'শায়খাইন' বলতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকে বুঝানো হয়। –অনুবাদক

উল্লেখ করা হয়েছে তবে, একটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে আর বাকীগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

খ. প্রত্যেকটি হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। সেটা কি সহীহ, হাসান, জয়ীফ নাকি মুনকার তা বলে দেয়া হয়েছে। জয়ীফ রেওয়ায়েতসমূহের জয়ীফ হবার কারণ স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা অন্তরদৃষ্টি লাভ করতে পারেন এবং নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন।

গ. প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছে, সেটি 'মশহুর' নাকি 'গরীব'।

ঘ. সাহাবী এবং ফকীহগণের মাযহাব উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসংগে প্রয়োজনানুসারে কারো নাম আবার কারো কুনিয়াহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা, জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্যে এ গ্রন্থে আর কোনো পর্দা রেখে দেয়া হয়নি। এ কারণেই বলা হয় "গ্রন্থটি মুজতাহিদের জন্যে যথেষ্ট আর মুকাল্লিদের জন্যে পর্যাপ্ত।"

ইজতিহাদী রায়ের প্রবণতা

এতোক্ষণ যে মনীষীদের কথা আলোচনা করলাম (এবং যাদেরকে মূলত আহ্লুল হাদীস বলা হয়), তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আরেক দল লোক ছিলেন, যারা মাসআলা কল্পনা করে তার জবাব নির্ণয় করার কাজকে খারাপ মনে করতেন না এবং ফতোয়া দিতেও ইতস্তত বোধ করতেন না। ইমাম মালিক ও সুফীয়ান সওরীর যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত এঁদের সময়কাল পরিব্যাপ্ত। এঁদের বক্তব্য হলো ঃ ফিকাহ্র উপরই দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই এর প্রসার ও পরিব্যাপ্তি আবশ্যক। অপরদিকে এঁরা রাসূলুল্লাহ্র (সা) হাদীস বর্ণনা করতে এবং হাদীসকে রাসূলুল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করতে ভয় পেতেন। যেমন শা'বী বলেছেন ঃ

"কোনো হাদীসকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাথে সম্পৃক্ত না করে সাহাবীদের সূত্রে বর্ণনা করাই আমার নিকট অধিক প্রিয় (আর মূলত সাহাবীদের সূত্রেই তো হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে), কেননা তাতে কোনো প্রকার কমবেশী হয়ে থাকলে, সে কমবেশীকে নবীর সাথে সম্পৃক্ত করার গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।"

ইব্রাহীম নখয়ী বলতেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্র (সা) সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করার চাইতে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আলকামা বলেছেন'– এ পদ্ধতিতে বলাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন রাসূলুল্লাহ্র (সা) কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন (হাদীস বর্ণনার বিরাট দায়িত্বানুভূতির ফলে) তাঁর মুখমণ্ডলে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হতো। তিনি বলতেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ কিংবা এরি কাছাকাছি বলেছেন।"

আনসারদের দ্বারা গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে কুফা পাঠানোর সময় উমার (রা) তাঁদের বলেছিলেন ঃ

"তোমরা কুফায় যাচ্ছো। শোনো! সেখানে তোমরা এমনসব লোকদের সাক্ষাত পাবে, যারা কুরআন পড়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তোমাদের দেখে তারা বলবে ঃ 'মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথীরা এসেছেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথীরা আগমন করেছেন।' তারা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তোমরা কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র (সা) পক্ষ থেকে যথাসম্ভব কম হাদীস বর্ণনা করবে।"

ইবনে আউন বলেছেন ঃ "শা'বীর নিকট কোনো মাসআলা এলে, তিনি (ভয়ে) তার জবাব দেয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইতেন। পক্ষান্তরে ইব্রাহীম নখয়ীর নিকট কোনো মাসআলা এলে, তিনি তার জবাব দিতে ইতস্তত করতেন না।"[৫৪]

তাখ্‌রীজের কারণ

(আহ্‌লুল হাদীস এবং আহ্‌লুর রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী লোকেরা) হাদীস, ফিকাহ এবং মাসায়েলের যেসব সংকলন তৈরী করেছিলেন, সেগুলো যেভাবে তাদের কাজে লেগেছিল এবং প্রয়োজন পূরণ করেছিল, তার কারণ ছিলো ভিন্ন। (আর এ লোকেরা তা থেকে সেই ফায়দা লাভ করতে পারেননি, যা পেরেছিলেন সেসব লোকেরা অর্থাৎ হাদীসের আলিমগণ)। এর কারণগুলো এখন আমি বিশ্লেষণ করছি।

ক. এঁদের কাছে হাদীস এবং আছারের সেই বিরাট ভাণ্ডার ছিলো অনুপস্থিত, যার ভিত্তিতে তারা হাদীসের আলিমগণের অনুসৃত মূলনীতির ভিত্তিতে ফিকহী মাসায়েল ইস্তিম্বাত করতে পারতেন।

খ. পূর্বতন (সকল) আলিমগণের মতামত (ও মতপার্থক্য)-সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা এবং সেগুলো একত্র করে গবেষণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সঠিক মত নির্বাচন করার ব্যাপারে তাদের বক্ষ প্রশস্ততা লাভ করেনি। পক্ষান্তরে তারা এ ব্যাপারে এমন পন্থা অবলম্বন করেন, যার ফলে অপবাদ ও দুর্নামের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। তারা (অন্যদের ত্যাগ করে) কেবল নিজেদের উস্তাদ ও ইমামদেরই অনুসরণ করেন এবং ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে এঁদের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা নিজেদের অন্তরে বদ্ধমূল করে নেন। মোটকথা, নিজেদের উস্তাদ ও অগ্রবর্তীদের প্রতি তাদের অন্তর চরমভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। যেমন, আলকামা স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চাইতে অধিকতর মজবুত রায়ের অধিকারী কোনো সাহাবী ছিলেন কি?" আর আবু হানীফা (রাহ) বলেছেন ঃ "ইব্রাহীম নখয়ী সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের চাইতে বড় ফকীহ ছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার যদি সাহাবীর মর্যাদা লাভ না করতেন তবে আমি বলতাম, আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে উমারের চাইতে বড় ফকীহ।"

গ. আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এই লোকেরা এমন মন-মস্তিষ্ক ও বুঝ-জ্ঞান

---

৫৪. এ আছারগুলো দারেমীর সূত্রে উদ্ধৃত হলো। –গ্রন্থকার

লাভ করেছিলেন এবং একটি জিনিস থেকে আরেকটি জিনিসের প্রতি মনকে এতো দ্রুত ধাবিত করার সামর্থ্য লাভ করেছিলেন যে, স্বীয় উস্তাদ ও অগ্রবর্তীদের বক্তব্য থেকে অতি সহজে তারা মাসআলা তাখরীজ করতে পারতেন। আসল কথা হলো, যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়, তার জন্যে সেকাজ সহজও করে দেয়া হয়। ওয়া কুল্লু হিযবিন বিমা লাদাইহি ফারেহুন– আর মানুষের প্রতিটি দল তাদের নিকট যা কিছু আছে তাতেই মগ্ন।

মোটকথা, এসব কারণের প্রেক্ষিতে তারা 'তাখরীজ'কে নিজেদের ফিকাহ্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন।

তাখরীজ কি?

এখন প্রশ্ন হলো তাখরীজ কি? তাদের অনুসৃত তাখরীজ ছিলো এই যে, তাদের প্রত্যেকেই এমন একটি কিতাব মুখস্থ ও আত্মস্থ করে নিতেন, যাতে তার উস্তাদ ও অগ্রবর্তীদের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করা হয়েছে, তাদের বক্তব্যকে সর্বোত্তমভাবে জানার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের মতপার্থক্যের একটিকে আরেকটির উপর সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এরপর তারা প্রত্যেকটি মাসআলার বিধান কোন্ কারণের প্রেক্ষিতে নির্ণয় করা হয়েছে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। অতপর যখনই তাদের নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, কিংবা নিজেদেরই শরীয়তের কোনো বিধান জানার প্রয়োজন হতো, তখন স্বীয় উস্তাদ ও অগ্রবর্তীদের যেসব বক্তব্য তারা আত্মস্থ করেছিলেন, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। সেখানে যদি জবাব পেয়ে যেতেন, সানন্দচিত্তে তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু সেখানে যদি সরাসরি জবাব না পেতেন, তবে তাঁদের রায় ও বক্তব্যসমূহ যেসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতো সেগুলোর সাথে নিজের বিষয়টি মিলিয়ে দেখতেন এবং কোথাও না কোথাও তা খাপ খেয়ে যেত। কিন্তু এভাবেও যদি কোনো বিধান নির্ণয় করতে না পারতেন, তবে তাঁদের রায় ও বক্তব্যসমূহের আনুষঙ্গিক ইংগিতের প্রতি লক্ষ্য করতেন এবং তার ভিত্তিতে মাসআলা ইস্তিম্বাত করতেন।

প্রকৃতপক্ষে অনেক বক্তব্যের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত ও উপকরণ থাকে, যা থেকে কোনো মাসআলা বা সমস্যার স্পষ্ট সমাধান বুঝা যায়। কখনো এমন হতো যে, নিজের সম্মুখে উপস্থিত মাসআলাটির কোনো নজীর পূর্ববর্তীদের বক্তব্যের মধ্যে পেয়ে যেতেন, আর সে নজীরের উপর এ মাসআলাটির ভিত্তি স্থাপন করতেন। কখনো আবার এমন হতো যে, তারা পূর্ববর্তীদের নির্ণীত এমনসব বিধানের 'ইল্লত' তথা কারণ বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন, যেসব বিধান

সরাসরি প্রকাশ হয়নি, বরঞ্চ প্রকাশ হয়েছে তাখরীজ, সিবর[৫৫] কিংবা প্রত্যাখ্যানের (হযফ) মাধ্যমে। অতপর সেই ইল্লতকে নিজের মাসআলাটির সাথে সামঞ্জস্যশীল দেখতে পেলে সেটির বিধানই এটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। (এ ধরনের বিধান নির্ণয়কে তাখরীজের তাখরীজ বলা যেতে পারে)। আবার কখনো পূর্ববর্তী মুজতাহিদের দুটি মত তাদের সামনে আসতো। এ ক্ষেত্রে কোন্ মতটি নিজ মাসআলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তা তাদের ফায়সালা করতে হতো। এমতাবস্থায় 'কিয়াসে ইক্তিরানী'[৫৬] এবং 'কিয়াসে শর্তীর'[৫৭] ভিত্তিতে উভয় মতকে একত্র করলে যে রেজাল্ট বের হতো, সেটাকেই স্বীয় মাসআলাটির জবাব বলে ধরে নিতেন। কখনো অবস্থা এমন হতো যে, উস্তাদ ও অগ্রবর্তীদের বক্তব্যের মধ্যে এমন ফরমান থাকতো যা উপমা উদাহরণ এবং শ্রেণীবিন্যাস হিসেবে স্পষ্ট ছিলো। কিন্তু সেটার সঠিক ও যথার্থ সংজ্ঞা ছিলো অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সেটার সংজ্ঞা জানার জন্যে তারা ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন এবং সেটার সঠিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য অবগত হতেন। সঠিক ও যথার্থ সংজ্ঞা জেনে নিতেন। অস্পষ্ট ও কঠিন অংশগুলো স্পষ্ট করে নিতেন। কখনো উস্তাদ এবং অগ্রবর্তীদের বক্তব্য দ্ব্যর্থবোধক হতো। এমতাবস্থায় এঁরা চিন্তা গবেষণা করে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। কখনো অগ্রজদের

---

৫৫. 'সিবর' তাখরীজের মতোই একটি প্রচলিত (পারিভাষিক) শব্দ। এর অর্থ হলো, মূল জিনিসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তার এমন একটি অঙ্গ বা শাখার মধ্যে যাচাই করে দেখা, যার ভিত্তিতে মূল জিনিস সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে। অতপর মূল এবং শাখার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য যৌথভাবে বর্তমান পাওয়া যায়, তাকে গ্রহণ করে বাকীগুলোর উপর শুধু নযর আওড়িয়ে যাওয়া, যাতে করে বিধানের কারণ বা উদ্দেশ্য (ইল্লত) নির্ণীত হতে পারে। –অনুবাদক

৫৬. কিয়াসে ইকতিরানী মূলত যুক্তিশাস্ত্রীয় পরিভাষা। ফিকাহ শাস্ত্রেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে সেই কিয়াস যা দুটি ঘটনার বিবরণের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যার একটি ছোট, আরেকটি বড় এবং উভয়টি থেকে একই রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ "প্রতিটি দেহই সৃষ্ট আর প্রতিটি সৃষ্টিই ধ্বংসশীল। সুতরাং প্রতিটি দেহই ধ্বংসশীল।" ফিকাহ শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ হচ্ছে ঃ "সকল মাদকতাই মদ্য আর সকল প্রকার মদ্যই হারাম। সুতরাং সকল প্রকার মাদকতাই হারাম।" –অনুবাদক

৫৭. কিয়াসে শর্তী কিয়াসে ইকতিরানীরই শ্রেণীভুক্ত। তবে, ইকতিরানী থেকে এর পার্থক্য এই যে, এর দুটি অংশই শর্তযুক্ত। যেমন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ধ্বংসশীল হন, তবে তার সৃষ্টিও আছে। কিন্তু তিনি অবশ্যি ধ্বংসশীল। সুতরাং তার সৃষ্টিও আছে।
ফিকাহ শাস্ত্রে এর উদাহরণ হলো : বিয়েটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে তা অটুট বন্ধন হবে। কিন্তু বিয়েটি অবশ্যি বিশুদ্ধ। সুতরাং তার বন্ধন অটুট। –অনুবাদক

মাসায়েল এবং মাসায়েলের দলিল প্রমাণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি হয়ে থাকতো। এমতাবস্থায় এঁরা চিন্তা গবেষণা করে সেই অন্তরাল দূরীভূত করে দিতেন। আবার কখনো এই তাখরীজকর্তারা তাদের অগ্রজদের কোনো কাজ বা নীরবতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাখরীজের এ রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

মোটকথা, মাসায়েল ইস্তিম্বাতের এই তরীকাকেই 'তাখরীজ' বলা হয়।

মাযহাবী মুজতাহিদ

উপরোক্ত তরীকায় যে মাসআলা ইস্তিম্বাত করা হয়, তার উল্লেখ এভাবে করা হয়ে থাকে ঃ "এটি অমুকের তাখরীজ করা মাসআলা।" কিংবা বলা হয় ঃ "অমুক ইমামের মাযহাব অনুযায়ী বা অমুকের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি অনুযায়ী কিংবা অমুকের বক্তব্য অনুযায়ী মাসআলাটির জবাব এইরূপ।" আর এই তাখরীজকর্তাদের 'মাযহাবী মুজতাহিদ' বলা হয়ে থাকে। যারা বলে ঃ "যে ব্যক্তি মাবসুত[৫৮] আয়ত্ত করলো, সে মুজতাহিদ।" তাদের এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায়, সে যদি হাদীস সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না রাখে এবং একটি হাদীসও না জানে, তবু সে মুজতাহিদ। মূলত তাঁরা এই ইজতিহাদ দ্বারা সেই ইজতিহাদকেই বুঝিয়ে থাকেন, যা উপরোল্লিখিত তাখরীজের পন্থায় করা হয়েছে।

কিছু মাযহাব প্রসারিত আর কিছু মাযহাব সংকুচিত হবার কারণ

প্রতিটি মাযহাবে এ ধরনের তাখরীজ হয়েছে এবং জোরেশোরে হয়েছে। কিন্তু যেসব মাযহাবের ইমামরা ছিলেন মশহুর, স্বাভাবিকভাবেই রায় এবং ফতোয়ার পদমর্যাদায় তাদেরকেই অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের গ্রন্থাবলী সমাদৃত হয়ে পড়ে। চতুর্দিকে লোকেরা সেগুলোই পঠনপাঠনে লেগে পড়ে। এভাবেই সেসব মাযহাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং পড়তে থাকে। পক্ষান্তরে যেসব মাযহাবের ইমামদের নাম ততোটা খ্যাতি লাভ করেনি, যারা বিচার ফায়সালা এবং ফতোয়া দানের পদ লাভ করেননি এবং সাধারণ মানুষেরও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবার সুযোগ ঘটেনি, সেই মাযহাবগুলোই দিন দিন নির্জীব ও বিলীন হবার দিকে এগিয়ে গেছে।

---

৫৮. 'মাবসূত' হলো হানাফী মাযহাবের ইমাম সারাখসী লিখিত বিরাট ফিকাহ গ্রন্থ। —অনুবাদক

৮. সঠিক পন্থা ও সুষম নীতি

সঠিক পন্থা হলো মধ্যমপন্থা

উপরে যে দু'টি পন্থার কথা আলোচনা করে এলাম, অর্থাৎ (১) হাদীসের শব্দের হুবহু অনুসরণ এবং (২) ফকীহদের বক্তব্য থেকে মাসআলা তাখরীজ করা— এই উভয় পন্থারই দীনি ভিত্তি রয়েছে। সকল যুগের মুহাক্কিক আলিমগণ দু'টি পন্থাই অনুসরণ করে আসছেন। তবে (পার্থক্য ছিলো কেবল উভয় পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের। অর্থাৎ) তাদের কেউ তাখরীজের তরীকার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়েন আবার কেউ অধিক ঝুঁকে পড়েন হাদীসের শব্দ অনুসরণ নীতির প্রতি। (উভয় নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি তারা কেউই মনোযোগ দেননি।)

আসলে, এই দু'টি পন্থার কোনো একটিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয় পন্থার (অর্থাৎ আহলে হাদীস ও আহলে ফিকাহর) লোকেরাই এ কাজটি করেছেন। তারা একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু সঠিক পন্থা ছিলো এর চাইতে ভিন্নতর। উচিত ছিলো, উভয় তরীকাকে একত্র করে একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করে দেখা এবং একটিতে কোন ভুল ত্রুটি থাকলে অপরটি দ্বারা তা নিরসন করা। এ কথাটিই বলেছেন হাসান বসরী তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে ঃ

"কসম সেই আল্লাহর, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তোমাদের পথ হচ্ছে গালী (সীমালংঘনকারী) এবং জাফী (অপরিহার্য সীমার নীচে অবস্থানকারী) এর মাঝখান দিয়ে।"

অতএব, আহ্‌লে হাদীসের উচিত, তাদের অনুসৃত ও অবলম্বিত যাবতীয় মাসআলা এবং মাযহাবকে তাবেয়ী এবং পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ইমামগণের রায়ের সাথে তুলনা করে দেখা এবং তাদের ইজতিহাদ থেকে ফায়দা হাসিল করা। আর আহলে ফিকাহ্‌র লোকদেরও উচিত সাধ্যানুযায়ী হাদীসের ভাণ্ডারে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, যাতে করে সরীহ ও সহীহ হাদীসের বিপরীত মত প্রদান থেকে বাঁচতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে হাদীস কিংবা আছার বর্তমান রয়েছে, সেসব বিষয়ে মত প্রদান থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

আহলে হাদীসের বাড়াবাড়ি

হাদীসের ইমামগণ পূর্ণ ইতমীনানের সাথে যেসব বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন, অথচ সর্বাবস্থায় সেগুলোর অকাট্যতার পক্ষে শরীয়ত প্রণেতার কোনো সুস্পষ্ট দলিল নেই, সেগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো মুহাদ্দিসের এতোটা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যে, কোনো হাদীস (যা, এসব বিধিমালার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়নি) কিংবা সহীহ কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও সেসব বিধিমালার উপর অটল থাকবেন। যেমন ঃ (ক) কোনো হাদীস মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবার ব্যাপারে মামুলী কোনো সন্দেহ থাকলেও সেটিকে অস্বীকার করা, যেমনটি করেছেন ইবনে হাযম। তিনি বুখারীর বর্ণিত 'তাহ্রীমে মায়ারিফ' (গানবাদ্য হারাম হওয়া) সংক্রান্ত হাদীসটি কেবল সনদে ইনকিতা' থাকার সন্দেহে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে, হাদীসটি মুত্তাসিল এবং সহীহ। তাই ভিত্তিহীন সন্দেহকে কিছুতেই এতোটা গুরুত্ব দেয়া উচিত নয় যে, তার ভিত্তিতে কোনো হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা যাবে। এ ধরনের সন্দেহ কেবল তখনই মনোযোগ লাভের যোগ্য হয়, যখন সন্দেহ আরোপিত হাদীসটির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সহীহ হাদীস বর্তমান পাওয়া যাবে।

(খ) অথবা এমনটি বলা যে, "অমুক ব্যক্তি অমুকের বর্ণিত হাদীসের সবচাইতে বড় হাফিয।" এই মানসিকতার ভিত্তিতে তার বর্ণিত হাদীসকে অন্যদের বর্ণিত হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দান করা, যদিও অগ্রাধিকার লাভের পক্ষে অন্যদের মধ্যে হাজারো কারণ বর্তমান থাকে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, রাবীগণ 'অর্থভিত্তিক বর্ণনার' (রেওয়ায়াত বিল মা'না) সময় সাধারণত হাদীসের অর্থ ও মূল বক্তব্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন, ভাষাতত্ত্ববিদদের মতো ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন না। এমতাবস্থায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনার প্রতিটি বর্ণকে অনুকরণ করার কি গুরুত্ব থাকতে পারে? কোনো শব্দ আগে পরে ব্যবহার করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? মজার ব্যাপার হলো যে, তোমরা দেখবে একই হাদীস অপর কোনো বিশ্বস্ত রাবী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন। বক্তব্যের মধ্যে আগপাছ করেছেন।

সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক রাবী বাহ্যত যা বর্ণনা করেন তা নবীর (সা) বাণী বা ইরশাদ। তবে কোনো বর্ণনার বিপরীত কোনো হাদীস বা দলিল যদি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তবে এই বর্ণনাকে পরিত্যাগ করে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে।

আহ্লুর রায়ের বাড়াবাড়ি

একইভাবে তাখরীজকারীদেরও এমন কোনো কথা তাখরীজ করা উচিত নয়, যা তাদের পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্য ও বক্তব্যের ভাবধারার অনুসারী নয়, যেটাকে জ্ঞানী লোকেরা এবং ভাষাবিদরা পূর্ববর্তীদের বক্তব্যের অনুসারী এবং অনুকূল মনে করেন না এবং পূর্ববর্তীদের যে নজীর বা দৃষ্টান্তকে ভিত্তি করে তাখরীজ করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ এবং ভাষাবিদগণ তাখরীজটিকে সেই দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার ব্যাপারে একমত নন, এমনকি পূর্ববর্তীরা যদি বেঁচে থাকতেন এবং তাঁদের জিজ্ঞেস করা হতো যে, আপনাদের যে মাসআলাটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে এই তাখরীজটি করা হয়েছে, তা কি সেটার সাথে সামঞ্জস্যশীল? তখন, হয়তো তারা বলতেন যে, এক্ষেত্রে আমাদের যে উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ ছিল, তার সাথে এটা সামঞ্জস্যশীল নয়। (সুতরাং এই পন্থায় তাখরীজ করা বা রায় প্রদান করা সঠিক নয়, বরং বাড়াবাড়ি)। প্রকৃতপক্ষে তাখরীজ তো অবশ্যি মুজতাহিদের অনুকরণের ভিত্তিতে হতে হবে। মুজতাহিদের অনুকরণ বা তাকলীদের ভিত্তিতে যে তাখরীজ হবে, সেটাই বৈধ তাখরীজ। মুজতাহিদের বক্তব্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে তার যথার্থ অনুকরণ করতে পারলেই তাখরীজ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে।

একইভাবে নিজেদের কিংবা নিজেদের উস্তাদদের নির্ধারিত উসূলের অনুসরণ করতে গিয়ে (যে উসূল অকাট্য হবার কোনো প্রমাণ নেই) এমন কোনো হাদীস বা আছারকে বর্জন করা তাদের উচিত নয়, যা সকল হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ। (নিজেদের কিয়াস এবং উসূল অনুসরণ করতে গিয়ে) এ ধরনের কাজ করেছেন তারা 'হাদীসে মুসাররা'[৫৯] এবং গনীমতের মালে রাসূলুল্লাহর (সা)

---

৫৯. মুসাররা (মুসাররাতুন) সেই দুধদানকারী পশুকে বলা হয়, যাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গেরস্থ কয়েক বেলা দুধ দুহন করেনি, যাতে করে ক্রেতা তার উলান বড় দেখে প্রতারিত হয়। 'হাদীসে মুসাররা' বলতে সেই হাদীসটিকে বুঝানো হয়েছে, যাতে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি মুসাররা পশু ক্রয় করলো এবং তা দুহন করার পর তার প্রকৃত অবস্থা অবগত হলো, তার জন্যে পশুটি রাখার বা ফেরত দেবার ইখতিয়ার রয়েছে। সে যদি পশুটি ফেরত দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে দুহনকৃত দুধের বিনিময়ে মালিককে এক সা' পরিমাণ খুরমা প্রদান করতে হবে।"

হানাফী ফকীহরা এই কারণে হাদীসটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন যে ঃ 'হাদীসটির (অপর পৃষ্ঠায়)

নিকটাত্মীয়দের৬০ অংশ রদ করে দিয়ে। মনে রাখা দরকার, নিজেদের তৈরী তাখরীজের উসূলের তুলনায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত। এ সত্যটির প্রতি ইংগিত করেছেন শাফেয়ী (রহ)। তিনি বলেছেন :

"যে রায়ই আমি দিয়েছি, কিংবা নির্ধারণ করেছি কোন উসূল, [হাদীসে রাসূলের (সা) মুকাবিলায় তার কোনো গুরুত্ব নেই।] আমার রায় কিংবা উসূলের বিপরীত যদি রাসূলুল্লাহ্র (সা) পক্ষ থেকে কোনো বাণী পাওয়া যায়, তবে তাঁর বাণীকেই গ্রহণ করতে হবে।"

(আহলে হাদীস এবং আহলে রায়ের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে) এ যাবত আমরা যা কিছু বললাম, প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন আবু সুলাইমান খাত্তাবী তাঁর 'মুয়ালিমুস্ সুনান' গ্রন্থের শুরুর দিকে। তিনি বলেছেন :

"আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যুগের আলিমরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একটি দল হলো হাদীস ও আছারের অনুসারী আর অপর দলটি হলো ফিকাহ ও রায়পন্থী। তাঁদের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, (দু'টি বিপরীত ক্যাম্পে অবস্থান করা সত্ত্বেও) তারা নিঃসন্দেহে পরস্পরের নিকট সমভাবে মুখাপেক্ষী। নিজ নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তাদের একদলের পক্ষে আরেক দলকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। হাদীস এবং ফিকাহ একটি আরেকটির সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একটি অট্টালিকা এবং তার ভিত (Foundation)। এ ক্ষেত্রে হাদীস হচ্ছে 'ভিত' আর ফিকাহ হচ্ছে তার উপর নির্মিত 'অট্টালিকা'। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, কোনো অট্টালিকাকে যদি ভিত ছাড়াই নির্মাণ করা হয়, তবে তার পক্ষে যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়, তেমনি যে ভিতের উপর কোনো ইমারত নির্মাণ

বক্তব্য কিয়াসের বিপরীত। তাই এটি সাধারণ বিধান হতে পারে না। কিয়াস বলে দুধের বিনিময় সমপরিমাণ হওয়া উচিত। অথচ হাদীসটিতে বলা হয়েছে, দুধের পরিমাণ এক সের কিংবা দশ সের যাই হোক না কেন, তার বিনিময়ে এক সা' খুরমা প্রদান করতে হবে। —অনুবাদক।

৬০. রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটাত্মীয় মানে বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিব। খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে গনীমতের মাল প্রদান করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এর উপর আমল না হওয়ায় কিছু কিছু ফকীহ তাদের অংশ অস্বীকার করেন। —অনুবাদক

করা হয়না তাও মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না। উভয় দলের প্রত্যেকেই যদিও মর্যাদার দিক থেকে একে অপরের অপরিহার্য সাথী ও পরিপূরক, পরস্পরের মুখাপেক্ষী এবং কারো পক্ষে কাউকেও বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্বেও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি পরস্পরের প্রতি বিমুখ। অথচ হকের পথে পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার পরিবর্তে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করাই ছিলো তাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এদের মধ্যে যে দলটির নাম 'আহলে হাদীস' তাদের অধিকাংশই রেওয়ায়াত বর্ণনা করা, সনদ সংগ্রহ করা এবং এমনসব গরীব ও শায হাদীস অন্বেষণ করার কাজে তৎপর, যেগুলোর অধিকাংশই হয় মওদু' না হয় মাকলুব[৬১]। তারা হাদীসের মতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না, অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করে না, বক্তব্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে যত্নবান হয়না এবং বক্তব্যের গভীরে দৃষ্টিদান করে অন্তর্নিহিত ভাব বের করার চেষ্টা করে না। তারা প্রতিনিয়ত ফকীহদের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, তাদের দুর্নাম রটায় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সুন্নাতে রাসূলের বিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপিত করতে থাকে। অথচ তারা এ জিনিসটা বুঝে না যে, ফকীহ্দেরকে শরীয়তের যে বুঝ ও জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা সে পর্যায়ে পৌছুতে অক্ষম। তারা একথাও বুঝতে পারছে না যে, খামোকা তাদের বিরুদ্ধে মন্দবাক্য উচ্চারণ করে তারা গুনাহ্গার হচ্ছে। বাকী থাকলো দ্বিতীয় দলটির কথা, যারা ফিকাহ্ ও রায়পন্থী। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই হাদীসের সাথে ব্যাপক ও গভীর সম্পর্ক রাখে, সহীহ-জয়ীফ হাদীসের তারতম্য করতে পারে এবং কৃত্রিম হাদীস থেকে খাঁটি হাদীস পৃথক করার যোগ্যতা রাখে। হাদীসের ব্যাপারে তারা এতোই বেপরোয়া যে, তাদের অবলম্বিত মাযহাব এবং পছন্দনীয় রায়ের অনুকূলে কোনো হাদীস পাওয়া গেলে, সেটাকেও তারা তাদের বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতে কোনো প্রকার পরোয়া করেনা। তাদের ইমাম ও উস্তাদদের নিকট কোনো 'খব্‌রে জয়ীফ' এবং 'হাদীসে মুনকাতি'ও যদি মশহুর এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে থাকে, তবে, তার ভিত্তি যতোই টোটকা এবং বিশুদ্ধতা যতোই সন্দেহযুক্ত হোকনা কেন, সেটাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা নিজেদের মধ্যে

---

৬১. 'মাকলুব' হচ্ছে সেই হাদীস, রাবীর ভ্রান্তির কারণে যার শব্দ বা বাক্য আগপাছ হয়ে গেছে। —অনুবাদ

সমঝোতা করে নিয়েছে। সুতরাং এটা রায়ের এক বিরাট ভ্রান্তি ও সন্দিগ্ধতা। এই লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, (আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে তাদেরকে তৌফিক দান করুন), তাদের নিকট যদি তাদের মাযহাবের প্রথম সারির কোনো ব্যক্তি কিংবা তাদের স্কুলের কোনো দায়িত্বশীল চিন্তাবিদের ইজতিহাদকৃত কোনো কথা বর্ণনা করা হয়, তবে সেটা গ্রহণ করার জন্যে কথাটি কার বা কাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে তারা সেটা দেখে নেয় এবং কেবল সেকাহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কথাটাই গ্রহণ করে। এই অনুযায়ী আমরা মালেকীদের দেখতে পাই, তারা তাদের মাযহাবের ইমাম ও দায়িত্বশীলদের বক্তব্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইব্‌নে কাসেম, আশ্‌হুব এবং এদের সমপর্যায়ের লোকদের বর্ণনার উপরই নির্ভর করে। কিন্তু এদের তুলনায় কিছুটা কম মর্যাদার আলেমদের মাধ্যমে যদি মাযহাবের ইমাম ও দায়িত্বশীলদের এমন কোনো বক্তব্য শুনতে পায়, যা এদের বর্ণনার বিপরীত, তবে তারা তা গ্রহণ করেনা। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবদুল হাকাম এবং তার সমপর্যায়ের লোকদের বর্ণনা। তুমি হানাফীদের দেখতে পাবে, তারা আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং আবু হানীফার ছাত্রদের মধ্যে এদের সমপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মাধ্যম ছাড়া অন্যদের মাধ্যমে তারা আবু হানীফার বক্তব্য গ্রহণ করে না। তারা হাসান ইব্‌নে যিয়াদ লুলুবী এবং তার সমপর্যায়ের বা তার চাইতে নিচের দরজার আলেমদের মাধ্যমে উপরোক্তদের বর্ণিত বক্তব্যের বিপরীত আবু হানীফার কোনো বক্তব্য পেলে সেটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়না। সেটাকে নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য মনে করেনা। একইভাবে তুমি শাফেয়ীর মুকাল্লিদদের দেখতে পাবে, তারা শাফেয়ীর বক্তব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল মুযান্নী এবং রবী ইবনে সুলাইমান মুরাদীর বর্ণনাকেই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু হারমালা, জীযী ও এদের সমপর্যায়ের লোকদের মাধ্যমে যদি উপরোক্তদের বর্ণনার বিপরীত শাফেয়ীর কোনো বর্ণনা তারা শুনতে পায়, সেটাকে তারা গ্রহণযোগ্যই মনে করেনা। মোটকথা, প্রত্যেক ফেরকার আলেমরাই তাদের ইমাম ও উস্তাদদের থেকে তাদের মাযহাবের আহকাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবলম্বন করে আসছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে (ফরূয়াত) এই হচ্ছে তাদের সতর্কতার দৃষ্টান্ত। যেখানে নিজেদের ইমাম ও অগ্রবর্তীদের থেকে এসব খুঁটিনাটি বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা এতোটা সেকাহ্, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য

মাধ্যম বা সূত্র অন্বেষণ করে, সেক্ষেত্রে কি করে তাদের পক্ষে সূত্রের বাছবিচার ছাড়াই অনায়াসে যেকোনো ব্যক্তির থেকেই সেই মহান ইমামের বাণী গ্রহণ করা বৈধ হতে পারে, যিনি সকল ইমামের ইমাম, রাব্বুল ইয্যতের রাসূল, যাঁর ফরমান সর্বাবস্থায় আমাদের জন্যে ফরয, যাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, যাঁর হুকুমের সম্মুখে মাথানত করে দেয়া আমাদের জন্যে অবশ্যকর্তব্য, যাঁর ফায়সালা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র অনীহা, সংকীর্ণতা ও হঠকারিতার উদ্রেক হওয়া আমাদের জন্যে বয়ে আনবে চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতি?... আসলে কিছুলোক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই বাচাই করে খাঁটি ও প্রকৃত জ্ঞান হাসিল করাকে দুষ্কর মনে করে নিয়েছে। তারা মনে করছে, এ পন্থায় জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হওয়া এক সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অথচ তারা অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই মন্‌যিলে মাকসাদে পৌছে যেতে চায়। এজন্যে তারা জ্ঞান লাভের পথকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে। সীমিত কিছু কথা এবং উসূলে ফিকাহ্‌র বিধিবদ্ধ নিয়ম থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিসকেই তারা নিজেদের জন্যে যথেষ্ঠ মনে করে নিয়েছে। আর তারা এটার নাম রেখেছে 'ইলাল' যাতে করে তাদেরকেও জ্ঞানের পঞ্চআরোহীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এসব তত্বকে তারা তাদের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছে। আর এসব তত্বকে তারা বিরোধী পক্ষের সাথে বিতর্কযুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এরি অন্তরালে তারা চুলচেরা খুঁজে খুঁজে বের ক'রে ঝগড়া ও বিতর্কের উপকরণ সংগ্রহ করে এবং তাই দিয়ে বিপক্ষের সাথে বাহাছ ও মুনাযেরায় লিপ্ত হয়ে তুফান সৃষ্টি করে। অতপর মুনাযেরার ময়দান থেকে ফিরে এসে বাকযুদ্ধে বিজয়ী ব্যক্তির মাথায় তারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের শিরোপা পরিয়ে দেয়। আর তাকেই তারা যুগের সেরা ফকীহ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে নেয়। এতো গেলো তাদের অবস্থার একদিক। কিন্তু এর চাইতেও লজ্জাকর দিক হলো, শয়তান অতি সংগোপনে একটি সূক্ষ্ম কৌশল তাদের অন্তরে উদ্রেক করে দিয়েছে এবং তাদেরকে এক সুগভীর ফাঁদে ফেঁসে দিয়েছে। অর্থ সে তাদেরকে এই পাঠদান করেছে যে, তোমাদের কাছে জ্ঞানের যে পুঁজি আছে তা খুবই নগণ্য। তা দিয়ে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হ'তে পারেনা এবং তা তোমাদের জন্যে যথেষ্টও হতে পারেনা। সুতরাং 'ইল্‌মে কালাম' শিখে সেটাকে মজবুত করে নাও। ইল্‌মে কালামের কিছু কিছু বিতর্ক পদ্ধতি শিখে

নিয়ে তাতে পট্টি লাগাও। এইসাথে মুতাকাল্লিমদের (দার্শনিক বা দর্শনবেত্তাদের) কিছু নীতিমালা শিখে নাও, এতে তোমাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা বাড়বে এবং দৃষ্টি প্রশস্ত হবে। এভাবে ইবলিস তাদের উপর তার চিন্তাকে সত্যে পরিণত হতে দেখলো। তাদের বিরাট সংখ্যক লোক শয়তানের আনুগত্য ও অনুবর্তনের পথ ধরলো। কেবল অল্পসংখ্যক ঈমানদার লোকই এ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। আফসোস, এই লোকদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি! তারা কোথায় ছুটে চলেছে ? শয়তান তাদেরকে তাদের লক্ষ্যপথ ও হিদায়াত থেকে কোন্দিকে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? কেবল মহান আল্লাহই সেই সত্তা, যার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"[৬২]

---

৬২. ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী ঃ মুয়ালিমুস সুনান।

তাকলীদবিহীন যুগ

জেনে রাখো, পহেলা এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে কোনো নির্দিষ্ট ফিকহী মাযহাবের তাকলীদ করবার প্রচলন ছিলনা। এ প্রসংগে আবু তালিব মাক্কী তাঁর 'কুওয়্যাতুল কুলূব' গ্রন্থে লিখেছেন : "এইসব (ফিকাহ্‌র) গ্রন্থাবলী তো পরবর্তীকালে রচিত ও সংকলিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকে লোকদের কথাকে (শরীয়তের বিধানরূপে) পেশ করা হতো না। কোনো এক ব্যক্তির মাযহাবের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া হতো না। সকল (মাসআলার) ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির মতই উল্লেখ করা হতো না এবং কেবল এক ব্যক্তির মাযহাবকেই বুঝার চেষ্টা করা হতো না।"

আমি বলবো, তখন লোকদের অবস্থা ছিলো এর চাইতেও সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তখন মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলো। এক শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন আলিম আর অপর শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন সাধারণ মুসলমান। সাধারণ মুসলমানরা সর্বসম্মত বা মতবিরোধহীন মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের তাকলীদ করতেন না, বরঞ্চ সরাসরি শরীয়ত প্রণেতা আলাইহিস সালামের অনুসরণ অনুকরণ করতেন। তারা অযু গোসল প্রভৃতির নিয়ম পদ্ধতি এবং নামায যাকাত প্রভৃতির বিধান তাদের মুরব্বীদের নিকট থেকে অথবা নিজেদের এলাকার আলিমদের থেকে শিখতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতেন। আর যখন কোনো বিরল ঘটনা ঘটতো তখন মত ও মাযহাব নির্বিশেষে যে কোনো মুফতী তারা পেতেন তার নিকটই সে বিষয়ে ফতোয়া চাইতেন। ইবনে হুমাম তাঁর 'আত তাহরীর' গ্রন্থের শেষ দিকে লিখেছেন :

"সেকালে লোকেরা কখনো একজন আলিমের নিকট ফতোয়া চাইতেন আবার কখনো আরেকজন আলিমের নিকট। কেবল একজন মুফতীর নিকটই ফতোয়া চাওয়ার নিয়ম ছিল না।"

আলিম শ্রেণীর লোকেরা আবার দুই ধরনের ছিলেন।

(১) এক ধরনের আলিম ছিলেন তাঁরা, যাঁরা কিতাব, সুন্নাহ এবং আছারে সাহাবার উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেককে পূর্ণশক্তিতে প্রয়োগ করেন এবং এতোটা উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেন যে, জনগণ ফতোয়ার ব্যাপারে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর তাঁরা ফতোয়া

দানের ক্ষেত্রে এতোটা বুৎপত্তি লাভ করেন যে, সাধারণত সকল মাসায়েলের জবাব দানের যোগ্যতা অর্জন করেন। কোনো মাসায়েলের জবাব দান থেকে বিরত থাকার ঘটনা তাঁদের ক্ষেত্রে কদাচিতই ঘটতো। জ্ঞান গবেষণা ও ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে এমন বুৎপত্তির অধিকারী আলীমদেরই বলা হয় 'মুজতাহিদ'।

এরূপ (ইজতিহাদী) যোগ্যতা দু'ভাবে অর্জিত হয়। কখনো সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়ায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে রেওয়ায়েত সংগ্রহ করার মাধ্যমে এ যোগ্যতা অর্জন করা হয়। কারণ, আহকামের একটা বিরাট অংশ রয়েছে হাদীসের মধ্যে। আরেকটা বিরাট অংশ রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী এবং তাবে' তাবেয়ীগণের আছারের মধ্যে। (তাই একজন মুজতাহিদ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই রেওয়ায়েতের ভাণ্ডার থেকে মাসায়েল অবগত হতে পারেন)। আর এ কথাতো পরিষ্কার যে, একজন চোখ-কান খোলা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন আলিম ভাষা এবং বাক্য প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত থাকেন না। তাছাড়া এমন ব্যক্তিকে বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়েতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নিয়ম পদ্ধতি এবং দালায়েলের তারতীব নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়েও বুৎপত্তির অধিকারী হতে হয়। এরূপ যোগ্যতার বাস্তব উদাহরণ হলেন দুই মহান ইমাম, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহুইয়া (রাহিমাহুমাল্লাহ)।

আবার কখনো তাখরীজের তরীকাসমূহকে পূর্ণভাবে আত্মস্থ করা এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে ফিকাহ্‌র ইমামগণ বর্ণিত উসূলী নিয়ম কানুন আয়ত্ত করার মাধ্যমে এ যোগ্যতা অর্জিত হয়। তবে সেইসাথে হাদীস এবং আছারের একটা যুক্তিসংগত পুঁজি আয়ত্ত থাকা শর্ত। এরূপ ইজতিহাদী যোগ্যতার পূর্ণাংগ উদাহরণ হলেন দুই মহান ইমাম, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহিমাহুমাল্লাহ)।

(২) আরেক ধরনের আলিম ছিলেন তাঁরা, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর এতোটা বুৎপত্তি রাখতেন যে, ফিকাহ্‌র মূলনীতি এবং মৌলিক মাসআলাসমূহ বিস্তারিত দলিল প্রমাণের সাথে অবগত হবার যোগ্যতা রাখতেন। কিছু কিছু প্রাসংগিক মাসআলার ক্ষেত্রে নিজেরাই রায় প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা রাখতেন। অবশ্য এরূপ কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে আবার নীরবতা অবলম্বন করতেও বাধ্য হতেন এবং এসব ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কেননা, স্বাধীন মুজতাহিদের মতো তাঁরা ইজতিহাদের পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন না। অতএব এসব আলিম কিছু কিছু মাসায়েলের ক্ষেত্রে ছিলেন গায়রে

মুজতাহিদ। সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের ব্যাপারে তো মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, যখনই তাঁদের নিকট কোনো হাদীস পৌঁছুতো, তখন তাঁরা কোনো প্রকার বিধি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই তার উপর আমল করতেন।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদের সূচনা

তৃতীয় হিজরী শতাব্দী ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুজতাহিদদের তাকলীদের বার্তা নিয়ে আসে। লোকেরা একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাব অনুসরণের বন্ধনে নিজেদের বন্দী করে নেয়। এক ব্যক্তির তাকলীদ করার বন্ধন থেকে খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই মুক্ত থাকে। এরূপ তাকলীদ করাকে লোকেরা তখন অপরিহার্য বানিয়ে নিয়েছিল। এর একটা বিশেষ কারণও ছিলো। তা হলো, কোনো ফিকাহ চর্চাকারী কোনো অবস্থাতেই দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত ছিল না।

১. একটি হলো এই যে ঃ হয়তো তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হয় ইতিপূর্বে মুজতাহিদগণ যেসব মাসায়েলের জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো অবগত হওয়া, সেগুলোর দলিল প্রমাণ আয়ত্ত করা, সেগুলোর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা এবং কোন্‌টির উপর কোন্‌টি অগ্রাধিকারযোগ্য তা নির্ণয় করার কাজে। এটা ছিলো একটা বড় কঠিন কাজ। এমন একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না, যিনি ফিকাহ্‌র প্রতিটি অধ্যায়ে মাসআলাকে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন এবং দলিল প্রমাণযুক্ত করে মাসআলাসমূহকে শক্তি ও সমৃদ্ধি দান করেছেন। এরূপ ইমামের অনুসরণ এজন্যে প্রয়োজন ছিলো, যাতে তাঁর প্রদত্ত দলিল প্রমাণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে যাবতীয় মাসায়েল খতিয়ে দেখা যায় এবং একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া যায়। এরূপ কোনো মুজতাহিদ ইমামের ইকতিদা করার সুযোগ না পেলে তার জন্যে একজন সফল ফকীহ হবার পথ জটিল হয়ে পড়তো। আর এ কথাতো অনস্বীকার্য যে, কোনো কাজের সহজ পথ খোলা থাকতে জটিল পথে অগ্রসর হবার কোনো অর্থ হয় না।

ফিকাহ্‌র এই গবেষক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একটি কথা খুবই বাস্তব যে, তিনি তার ইমাম মুজতাহিদের (যার অনুসরণ তিনি করেছেন) কোনো বক্তব্যকে উত্তম মনে করে তার সাথে একমত হবেন। আবার কোনো কোনো বক্তব্যের সাথে দ্বিমতও পোষণ করবেন। এক্ষেত্রে সামগ্রিক পর্যালোচনায় যদি তার ঐকমত্য অধিক হয় আর মতপার্থক্য হয় কম, তবে এই গবেষক ফকীহকে সেই ইমাম

মুজতাহিদের মাযহাবের 'আস্হাবুল উজুহ্'র[৬৩] অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে মতপার্থক্য যদি অধিক হয়, তবে তাকে উক্ত মাযহাবের 'আসহাবুল উজুহ্'র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ঐ ইমামের মাযহাবের ফকীহ বলেই গণ্য করা হয়। তবে ইনি ঐ সমস্ত লোকদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যারা অপর কোনো ইমামের এবং তার মাযহাবের অধিকাংশ মূলনীতি ও প্রসংগিক বিষয়ের ইকতিদা করেন।

তাছাড়া, এই আলিমের ইজতিহাদের মধ্যে এমনসব মাসআলার জবাবও পাওয়া যায়, যেসব বিষয়ে তাঁর পূর্বেকার ফকীহ্দের ইজতিহাদে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। এমনটিতো হবেই। কারণ, মানুষ নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় আর ইজতিহাদের দরজাও রয়েছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এমতাবস্থায় ইজতিহাদ করাতো তাঁর জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের (নতুন) ঘটানায় তিনি স্বীয় ইমামের চিন্তা বাদ দিয়ে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং আছার অনুসন্ধান করেন এবং মাসআলা ইস্তেম্বাত করেন। তবে এরূপ নতুন মাসায়েল নিঃসন্দেহে ঐসব মাসায়েলের তুলনায় অনেক কম, যেগুলোর জবাব পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণ প্রদান করেছেন। এরূপ মুজতাহিদকে সম্পর্ক রক্ষাকারী স্বাধীন মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব) বলা হয়।

২. দ্বিতীয় অবস্থা এই হতে পারে যে, তিনি ঐ সমস্ত মাসায়েল অবগত হবার জন্যে সর্বাধিক মনোনিবেশ করবেন, যেগুলো ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারীরা জিজ্ঞাসা করে, অথচ পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণ সেগুলোর জবাব দিয়ে যাননি। এই ফকীহ্ এমন একজন ইমাম মুজতাহিদের ইকতিদা করার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ফকীহ্র চাইতেও অধিক মুখাপেক্ষী, যার সংকলিত ফিকহী মূলনীতি থেকে প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁর জন্যে ফায়দা হাসিল করা সম্ভব। কেননা, ফিকহী মাসায়েলসমূহ তো পুঁতির মালার মতো একটার সাথে আরেকটা গ্রথিত এবং সকল প্রাসংগিক বিষয় মূল বিষয়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় তিনি যদি সকল

---

৬৩. 'আসহাবুল উজুহ' সেইসব আলিমদের বলা হয়, যারা কোনো ইমাম মুজতাহিদের মুকাল্লিদ এবং তাঁর মূলনীতি ও বক্তব্যকে ভিত্তি করেই মাসায়েল ইস্তেম্বাত করেন বটে, কিন্তু প্রাসংগিক মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশেষ বিশেষ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম মুজতাহিদের সাথে আবার মতপার্থক্যও করেন। এ ধরনের ইখতিলাফী মতামতও সেই ইমাম মুজতাহিদের মাযহাবের অংশ বলে গণ্য করা হয়। –অনুবাদক

মাযহাবের ফিকাহ্‌র যাচাই বাছাই এবং সকল মুজতাহিদের ইজতিহাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেন, তবে তিনি নিজেকে এমন এক অথৈ সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, জীবনভর চেষ্টা করেও যা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না এবং সম্ভবতঃ জীবনেও কুলকিনারায় পৌঁছুতে পারবেন না। সুতরাং তাঁর জন্যে পথ একটাই খোলা থাকে। তা হলো, অতীতে যেসব মাসায়েলের জবাব দেয়া হয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা করে প্রাসংগিক মাসায়েলসমূহের জবাব দেবেন। তবে ইমাম মুজতাহিদের সাথে তাঁর কোথাও মতপার্থক্য হবে না যে তা নয়। কখনো কখনো কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও স্থায়ী কিয়াসের ভিত্তিতে ইমামের সাথে তাঁর মতপার্থক্য হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা হবে মতৈক্যের তুলনায় নেহাত কম। এরূপ মুজতাহিদকে মুজতাহিদ ফীল মাযহাব (মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদ) বলা হয়।

তৃতীয় একটা অবস্থা এই হতে পারে যে, প্রথমতঃ তিনি ঐ সমস্ত মাসায়েল জানার জন্যে তাঁর পুরো প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবেন, ইতিপূর্বে মুজতাহিদ ও আলিমগণ যেগুলোর জবাব প্রদান করেছেন। অতঃপর কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে নিজের মনোনীত ও পছন্দনীয় মাসায়েলগুলোর ভিত্তিতে আরো অধিক প্রাসংগিক মাসায়েল বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু এরূপ করতে পারাটা একেবারে অসম্ভব ও অবাস্তব। কেননা, ওহী অবতীর্ণের বরকতময় যুগ এই লোকদের অনেক আগেই অতীত হয়ে গেছে। সে কারণে এ সময়কার প্রত্যেক আলিম অসংখ্য জরুরী ইলমী বিষয়ে অতীত আলিমগণের মুখাপেক্ষী। তাঁকে অতীত আলিমগণের সূত্রেই জানতে হবে হাদীসসমূহের মতন ও সনদগত পার্থক্য, রাবীগণের মর্যাদাগত পার্থক্য, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতাগত তারতম্য এবং মতবিরোধপূর্ণ হাদীস ও আছারসমূহের মধ্যে সমতা বিধানের পন্থা। তাঁদের সূত্রেই তাঁকে জানতে হবে কোন্‌সব হাদীস ফিকাহ্‌র উৎস? জটিল ও অপ্রচলিত শব্দাবলীর বিশ্লেষণ কিভাবে করতে হয়? উসূলে ফিকহার জ্ঞান লাভ করার পন্থা কি? এবং ঐ সকল মাসায়েল পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং পারস্পরিক বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বর্ণনা করার পন্থা কি, যেগুলো অতীত মুজতাহিদ ও আলিমগণের থেকে বর্ণিত হয়েছে? তাছাড়া ঐসকল বিরোধপূর্ণ রেওয়াতে ও মাসায়েল সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার পর সেগুলোর ফায়সালা করা এবং সেগুলোকে দলিল প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করার পন্থাও তাঁকে তাঁদের সূত্রে গ্রহণ করতে হবে। এই অসংখ্য জিনিসের জ্ঞান লাভ করতে করতে

যখন তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছুবেন, তখন আরো জরুরী ও প্রাসংগিক মাসায়েল উদ্ভাবন করার কাজে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আর মানুষ যতো মেধাবীই হোক না কেন, তার একটা সীমা আছে। এ সীমার বাইরে কিছু করতে সে অক্ষম।

অবশ্য চিন্তা গবেষণা ও দৃষ্টিভংগির এই পূর্ণতা ঐসব আলিমরা অবশ্যি লাভ করেছিলেন, যাঁরা ওহী বন্ধ হবার কাছাকাছি যুগে ইজতিহাদের শিরচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। কারণ, তাঁদের ইজতিহাদের যুগ এবং ওহী বন্ধ হবার সময়ের মধ্যে খুব বেশী ফারাক ছিল না। তখন জ্ঞান বিজ্ঞান এ সময়কার মতো বেশুমার শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়নি এবং ইজতিহাদকৃত মাসায়েলের বিরাট সম্ভার সমুপস্থিত ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও মাত্র গুটিকয়েক লোকের পক্ষেই এই পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। আর এ গুটিকয়েক লোকের অবস্থাও এরূপ ছিলো যে, তাদের পূর্ণতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাঁরা স্বীয় উস্তাদগণের অনুসরণের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন না। উস্তাদগণের ইলমী পথ-নির্দেশনার সাহায্যেই তাঁরা ইজতিহাদের পথে পা বাড়ান। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা এই শাস্ত্রে যথেষ্ট পরিশ্রম করে গেছেন এবং চিন্তা গবেষণার বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন, সেহেতু তাঁরা স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমাম ও মুজতাহিদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

তাকলীদের অপরিহার্যতা এবং এর সঠিক অর্থ

মোটকথা, মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব অনুসরণ করাটা এমন একটি কুদরতী রহস্য, যা আল্লাহ (হিকমত ও কল্যাণের খাতিরে) আলিমদের অন্তরে ইলহাম করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে, তাঁরা একমত হয়েছেন।[৬৪]

শাফেয়ী ফকীহ ইবনে যিয়াদ ইয়েমেনীর বক্তব্যে আমাদের উপরোক্ত মতের প্রতি সমর্থন রয়েছে। দুটি প্রশ্নের জবাবে ইমাম বুলকীনী ইমাম শাফেয়ীর মতের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তার জবাবে ইবনে যিয়াদ ইয়েমেনী বলেন ঃ

"তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত বুলকীনীর বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

---

৬৪. এটা গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মত। এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে ভিন্ন দৃষ্টিভংগিও রয়েছে। —অনুবাদক

না, যতোক্ষণ না তাঁর ইলমী মর্যাদা অবগত হবে। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব, গায়রে মুস্তাকিল এবং আতলুত তাখ্‌রীজ ও তারজীহ্‌। 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' বলে আমি বুঝাচ্ছি, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি ঐ ইমামের মাযহাবে অগ্রগণ্যতার অধিকার রাখেন, যে ইমামের মাযহাবের সাথে তিনি সম্পর্কিত। এমনকি মাযহাবের ভিতরে প্রাধান্য পাওয়া কোনো মতেরও তিনি বিরোধিতা করার যোগ্যতা রাখেন। শাফেয়ী মাযহাবের প্রাচীন ও পরবর্তী অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ আলিমের অবস্থাই অনুরূপ। সম্মুখে তাদের বৃত্তান্ত ও মর্যাদাগত ক্রমিক পর্যালোচনা উল্লেখ করা হবে। বুলকীনীকে যারা মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব বলে গণ্য করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তাঁর ছাত্র আবু যুরআ। তিনি বলেন, "একবার আমি আমার উস্তাদ ইমাম বুলকীনীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ শাইখ তকীউদ্দীন সবকী ইজতিহাদের রাজপথে চলেন না কেন, তাঁর মধ্যে তো ইজতিহাদের সমুদয় শর্তাবলী বর্তমান? তিনি কী কারণে তাকলীদ করেন? আবু যুরআ বলেন, আমি লজ্জায় তাঁর (বুলকীনীর) নাম আর উল্লেখ করলাম না। অথচ তাঁর সম্পর্কেও আমার একই প্রশ্ন! আমার প্রশ্ন শুনে তিনি চুপ থাকেন। অতপর আমি নিজেই জবাব দিতে লাগলাম ঃ আমার মতে, সেই সরকারী চাকুরী চলে যাবার ভয়ে তিনি এমনটি করছেন, যা চার মাযহাবের ফকীহ্‌দের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি চার মাযহাব থেকে খারিজ হয়ে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করবেন, তার সরকারী চাকরী হবে না। বিচারপতির পদ তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। লোকেরা তার কাছে ফতোয়া চাইতে আসবে না এবং তাকে বিদআতী বলে আখ্যায়িত করবে। আমার বক্তব্য শুনে তিনি মুচকি হাসলেন এবং এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন।" কিন্তু আবু যুরআর বক্তব্যের প্রতি আমার মন সায় দেয় না । এই নিকৃষ্ট স্বার্থ তাঁদেরকে কী করে ইজতিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারতো তা আমার বুঝে আসে না। ইজতিহাদের সমুদয় শর্তাবলী তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিচারপতির পদ এবং উপার্জনের উপায় উপকরণ তাঁদেরকে ইজতিহাদ থেকে বিরত রাখবে, এমন অবস্থা থেকে তাঁদের মর্যাদা তো অনেক ঊর্ধ্বে ছিলো। এই মনীষীদের সম্পর্কে এরূপ খারাপ ধারণা করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। কেননা, ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা যাঁদের রয়েছে, তাঁদের জন্যে ইজতিহাদ করা যে ওয়াজিব এ ব্যাপারে আলিমগণ সর্বসম্মত, একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং চাকুরী বাকুরী বা পার্থিব সুযোগ সুবিধার জন্যে তাঁরা একটি ওয়াজিব বিষয়কে সারা জীবন পরিত্যাগ

করেছেন, এমন কথা কী করে বিশ্বাস করা যেতে পারে? এমন ধরনের মন্তব্য করা আবু যুরআর পক্ষে কী করে উচিত হতে পারে? তিনি কেমন করে বুলকীনীর ব্যাপারেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য মনে করেন? অথচ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'শরহুত তান্‌বীহ'র তালাক অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

"ইমামগণের মতামতের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (অর্থাৎ একই বিষয়ে একজন ইমামের যে একাধিক মত দেখা যায়), তার কারণ হলো তাদের ইজতিহাদের পরিবর্তন হওয়া। যখন তারা যে জিনিসকে সঠিক বললেন, তাদের ইজতিহাদের দৃষ্টিতে সে সময়ের জন্য সেটাই সঠিক। আর সে কিতাবের গ্রন্থকার হলেন এমন এক ব্যক্তি যার ইজতিহাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। একথা অনেক আলিমই স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, উল্লেখিত গ্রন্থকার, ইবনে সব্বাগ, ইমামুল হারামাইন এবং গাযালী 'মুজতাহিদ মতলকে'র মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। ফতোয়ায়ে ইবনুস সিলাহে যে বলা হয়েছে 'এরা ইজতিহাদে মতলক নয় বরঞ্চ ইজতিহাদ ফীল মাযহাবের মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন', তার অর্থ হলো, তাঁরা 'মুজতাহিদ মতলক মুসতাকিল' (স্বাধীন একচ্ছত্র মুজতাহিদ) ছিলেন না। বরঞ্চ তাঁরা ছিলেন 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' (সম্পর্কযুক্ত স্বাধীন মুজতাহিদ)। 'ইজতিহাদে মতলক' দুই প্রকার হয়ে থাকে। (এক) 'ইজতিহাদে মতলক মুসতাকিল' এবং (দুই) 'ইজতিহাদে মতলক মুনতাসিব'। স্বয়ং ইবনে সিলাহ তাঁর 'কিতাবুল ফাতায়া' এবং নববী তাঁর 'শরহে মুহাযযাব' গ্রন্থে 'ইজতিহাদে মতলক'কে দুই প্রকার বলেছেন। প্রথমটি হলো 'মুসতাকিল' আর দ্বিতীয়টি হলো 'মুনতাসিব'। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথমোক্ত ধরনের ইজতিহাদের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, যা এখন আর খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। শেষোক্ত ধরনের ইজতিহাদের দরজা খোলা রয়েছে। কিয়ামতের শর্তাবলী প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে। কোনো যুগেই তা থেমে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, তা ফরযে কিফায়া। কোনো যুগের লোকেরা যদি এই ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে কসুর করে, এমনকি তা ত্যাগ করে বসে, তবে তারা সকলেই গুনাহ্‌গার হবে। একথা আমাদের আলিমগণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন। মাউরিদী তাঁর গ্রন্থ 'আল হাদীতে', রূইয়ানী তাঁর 'আল বাহারে' এবং বগবী তাঁর 'আত তাহযীব' গ্রন্থে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক আলিম তাঁদের গ্রন্থাবলীতে কথাটি পরিষ্কার করে

লিখেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইজতিহাদ ফীল মাযহাব দ্বারা এ ফরযে কিফায়া আদায় হতে পারে না। ইবনে সিলাহ একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন এবং নববীও 'শরহে মুহাযযাব'-এ তা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। আমিও আমার "আর রদ্দু আ'লা মান আখলাদা ইলাল আরদি ওয়া জাহালা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আস্‌রিন ফারদুন" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছি। এই আলিমগণ (যাদের কথা উপরে উল্লেখ করেছি) কেবল শাফেয়ী হবার কারণে' 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' হওয়া থেকে মুক্ত হতে পারেননি। নববী এবং ইবনে সিলাহ তাঁর 'তবকাতে' স্পষ্টভাষায় এ সত্যটি প্রকাশ করেছেন। ইবনে সাবকীও একই কথা বলেছেন। এ কারণেই তোমরা দেখতে পাচ্ছো এই মনীষীরা শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন এবং তাঁদের ফিকহী গ্রন্থাবলীকে শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহর কিতাব বলা হয়। শাফেয়ী হিসেবে তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাঁদের ফতোয়াসমূহকেও শাফেয়ী মাযহাবের ফতোয়া বলা হয়। যেমন এই গ্রন্থকার এবং ইবনে সিবাগকে বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইমামুল হারামাইন এবং গাযালীকে নিশাপুরের নিযামিয়া মাদ্রাসায় এবং ইবনে আবদুস সালামকে কায়রোর মাদ্রাসায়ে জাবীয়া এবং যাহিরিয়ার ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়। আর ইবনে দাকীকুল ঈদকে মাদ্রাসায়ে সিলাহিয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যা নাকি আমাদের ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের পাশেই অবস্থিত ছিলো। তাছাড়া মাদ্রাসায়ে ফাজিলিয়া এবং কামিলিয়ার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। অবশ্য যিনি এর চাইতে উর্ধ্বে উঠে 'ইজতিহাদ মতলক মুস্‌তাকিল'-এর মর্যাদায় উপনীত হন তিনি শাফেয়ী হওয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাঁর মতামতকেও শাফেয়ী ফিকাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় না। কিন্তু আমি যতোটা জানি একমাত্র আবু জাফর ইবনে জরীর তাবারী ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদায় উপনীত হতে পারেননি। তিনি প্রথমত শাফেয়ীই ছিলেন। পরে একটি স্বাধীন ফিকহী মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। এ কারণেই রাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন ঃ তাঁর (তাবারীর) মতামত (শাফেয়ীর) মাযহাবের মধ্যে গণ্য নয়।"

সুয়ূতীর ভাষ্যে ইবনে সবকীর যে মর্যাদা পরিষ্কার হলো, আমার মতে তা আবু যুরআর মতের চাইতে উত্তম। আর আমার মতে এটাই প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু তিনি যে বললেন, ইবনে জরীরকে শাফেয়ী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা যাবে না,

একথা আমি সমর্থন করি না। কেননা আল্লামা রাফেয়ীই (সুয়ূতী যার কথা উদ্ধৃত করেছেন) তাঁর 'কিতাবুয যাকাতের' শুরুতে লিখেছেন ঃ "ইবনে জরীর তাবারীর মতামত আমাদের মাযহাবের মতামত বলে গণ্য নয়। অবশ্য তিনি নিজে আমাদের মাযহাবের লোক।" নববী তাঁর 'আত তাহযীব' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আবু আসিম ইবাদী ইবনে জরীরকে শাফেয়ী ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি আমাদের প্রথম সারির আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি রবী মুরাদী এবং হাসান জা'ফরানী থেকে শাফেয়ী ফিকাহ্র জ্ঞান লাভ করেন।" তাকে শাফেয়ীর সাথে সম্পর্কিত করার অর্থ হলো, তাঁর ইজতিহাদ ও দলিল গ্রহণ পদ্ধতি এবং সেগুলোর বিন্যাস শাফেয়ীর ইজতিহাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কোথাও যদি সামঞ্জস্যশীল না-ও হয়, তাতে তার বিশেষ গুরুত্ব লাভ হয় না। আর এতে করে (শাফেয়ীর) মাযহাব থেকে মুক্তও হয়ে যাননা। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারীও এই পর্যায়েরই একজন। তাঁকেও শাফেয়ী ফকীহ্দের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁকে যারা শাফেয়ী ফকীহ্দের মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন শাইখ তাজুদ্দীন সব্কী। তাঁর মতে ঃ "ইমাম বুখারী হুমাইদী থেকে এবং হুমাইদী শাফেয়ী থেকে ফিকাহ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।" আমাদের আল্লামা শাইখও বুখারীকে শাফেয়ী বলে গণ্য করতেন। তাঁর দলিল হলো সবকীর বক্তব্য। আমরা উপরে নববীর যে বক্তব্য উল্লেখ করেছি, তাও এ বক্তব্যের সমর্থক। শাইখ তাজুদ্দীন সবকী তাঁর তবকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"কোনো তাখরীজকারী যদি এমন কোনো তাখরীজ করেন যা সম্পূর্ণ বিরল ও অসাধারণ, তবে এই তাখরীজকারীর জীবনে যদি মাযহাব এবং তাকলীদ প্রভাবশীল হয় তবে তাকে (শাফেয়ী) মাযহাবের লোক বলে গণ্য করা হবে। যেমন ঃ শাইখ আবু হামিদ গাযালী এবং কিফাল। পক্ষান্তরে তাঁর জীবনে যদি ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব ও তাকলীদ প্রভাবশীল না হয়ে থাকে, তবে তাঁকে শাফেয়ী বলে গণ্য করা হবে না। যেমন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে জরীর, মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল মরূযী এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির। এখন প্রশ্ন থেকে যায় মুযনী এবং ইবনে শুরাইহ্ কোন পর্যায়ের লোক? গবেষণা থেকে বুঝা যায়, তাঁদের অবস্থান মাঝামাঝি পর্যায়ে। উপরোক্ত চার মুহাম্মাদের মতো তাঁরা শাফেয়ী থেকে খারিজও নন, আবার ইরাকী এবং খোরাসানীদের মতো শাফেয়ী মাযহাবের শিকলেও আবদ্ধ নন।"

তাছাড়া, সবকী তাঁর 'তবকাতে' আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম আবুল

হাসান আশ'আরী সম্পর্কেও লিখেছেন ঃ "তিনিও শাফেয়ী ফকীহ্দের অন্তর্ভুক্ত। শাইখ আবু ইসহাক মরূযী থেকে তিনি ফিকাহ শিখেছেন।"৬৫ 'কিতাবুল আনওয়ারে'ও তাকলীদ সম্পর্কে আমাদের মতের সমর্থন রয়েছে। এর গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

"যেসব লোক নিজেদেরকে শাফেয়ী, আবু হানীফা, মালিক এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করেন, তারা কয়েক শ্রেণীর ঃ প্রথমত, সাধারণ মানুষ। এরা সরাসরি নয়, বরঞ্চ ঐসব আলিম ও ফকীহ্দের মাধ্যমে ইমামের তাকলীদ করেন, যারা নিজেদেরকে ইমামের মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন শাফেয়ী মাযহাবের সাধারণ মানুষ সেই মাযহাবের ফকীহ ও আলিমগণের মাধ্যমেই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের তাকলীদ করেন। দ্বিতীয়ত, ঐসব লোক, যারা ইজতিহাদের মর্যাদায় পৌঁছেছেন। যদিও একজন মুজতাহিদ আরেকজন মুজতাহিদের তাকলীদ করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদেরকে ইমাম মুজতাহিদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়। কারণ, তাঁরা ইজতিহাদের পদ্ধতি, দলিল ও যুক্তি গ্রহণের ধরন ও বিন্যাসরীতি ইমাম মুজতাহিদ মতলক থেকেই গ্রহণ করেছেন। তৃতীয়ত, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণী। এরা যদিও ইজতিহাদের দরজা লাভ করেননি, কিন্তু ইমাম কর্তৃক গৃহীত ইজতিহাদের নীতিমালা এদের নিকট সুস্পষ্ট ছিলো। এরা এ ব্যাপারে যোগ্য ছিলেন যে, ইমামের যেসব মতামত ও মাসআলায় যুক্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল না, তাঁরা ইমামের অপর যুক্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত মাসআলার ভিত্তিতে সেগুলোর জবাব দিতে পারতেন। এরা মূলতঃ ইমামের মুকাল্লিদই ছিলেন, যেমন প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা এঁদের ইস্তিম্বাত করা বক্তব্য মতামত অনুসরণ করেও ইমামেরই মুকাল্লিদ।"

একটি অভিযোগ এবং তার জবাব

প্রশ্ন করা যেতে পারে,

"শরীয়াত যখন একটিই, তখন সে শরীয়তে একটি জিনিস এক সময় ওয়াজিব না থাকা আর অপর সময় তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়াটা কেমন

---

৬৫. ইবনে যিয়াদ ইয়েমেনীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো। -গ্রন্থকার

ব্যাপার? একই শরীয়াতে তো এমনটি হতে পারে না। সুতরাং 'প্রথমত মুজতাহিদ মুসতাকিল-এর ইকতিদা ওয়াজিব ছিল না, পরে তা ওয়াজিব হয়ে যায়।' এটা পরস্পরবিরোধী কথা নয়কি?" এর জবাবে আমি বলবো : প্রকৃতপক্ষে ওয়াজিব তো হচ্ছে, উম্মতের মধ্যে এমনসব লোক বর্তমান থাকা, যারা প্রাসংগিক বিধানসমূহকে মজবুত দলিল প্রমাণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা রাখেন। সমস্ত হকপন্থী লোকেরা এই ওয়াজিবের ব্যাপারে সর্বসম্মত। একইভাবে এ বিষয়টিও সর্বসম্মত যে, যে জিনিস কোনো ওয়াজিব বিধান লাভ করার মাধ্যম, স্বয়ং সে জিনিসটিও ওয়াজিব। আর কোনো ওয়াজিব বিষয় লাভ করার যদি একাধিক মাধ্যম বা পন্থা থাকে, তবে সেগুলোর কোনো একটি পন্থা গ্রহণ করা ওয়াজিব। কিন্তু কোনো ওয়াজিব বিষয় লাভ করার উপায় বা পন্থা যদি একটিই বর্তমান থাকে, তবে সেটিই ওয়াজিব। যেমন, ক্ষুধায় এক ব্যক্তির জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। আর ক্ষুধা নিবারণের কয়েকটি উপায় বা পন্থা তার নিকট রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে খাবার কিনে খেতে পারে, বাগান থেকে ফল পেড়ে খেতে পারে অথবা খাওয়ার উপযুক্ত প্রাণী শিকার করে খেতে পারে। এখন এ ব্যক্তির জন্যে তিনটি উপায়ের 'যে কোনো একটি' অবলম্বন করা ওয়াজিব, নির্দিষ্ট একটি নয়। কিন্তু সে যদি এমন কোনো স্থানে থাকে, যেখানে কোনো ফল এবং শিকার পাবার সুযোগ নেই, তবে সেক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে খাবার ক্রয় করেই ক্ষুধা বিরাবণ করা তার জন্যে ওয়াজিব। (আলোচ্য মাসআলাটি এ দৃষ্টান্তের সাথে তুলনীয়)। এই মূল ওয়াজিব হাসিল করার জন্যেও অতীত আলিমগণের নিকট কয়েকটা পন্থা ছিলো। সুতরাং কয়েকটা পথের মধ্যে যে কোনো একটিকে অবলম্বন করাই ছিলো তাঁদের জন্যে ওয়াজিব, নির্দিষ্ট একটিকে অবলম্বন করা নয়। অতপর তাঁরা যখন একটি পথ[৬৬] অবলম্বন করলেন, তখন সেই একটি ছাড়া বাকী সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সকলের জন্যে এই একটি পথের অনুসরণই ওয়াজিব হয়ে পড়ে। উলামায়ে সল্‌ফ্‌ হাদীস লিখতেন না। কিন্তু আধুনিককালে কি দেখ্‌ছো? এখন হাদীস লেখা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। কারণ, মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং গ্রন্থাবলীর

৬৬. অর্থাৎ তাকলীদের পথ। এখানে সেই প্রশস্ত অর্থে তাকলীদের কথা বুঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ একটু আগেই আলোচিত হয়েছে। –অনুবাদক

মাধ্যম ছাড়া এখন আর হাদীস জানার কোনো উপায় নেই।

(আরবী ভাষার) ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারেও একই কথা। উালামায়ে সল্ফ্ এগুলির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ আরোপ করতেন না। কারণ, আরবী ছিলো তাঁদের মাতৃভাষা। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ে শিক্ষালাভের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অথচ আমাদের যুগের আলিমদের জন্যে আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শেখা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের আরবী থেকে বর্তমান সময়টার ব্যবধান বিরাট। এরকম আরো অনেক উদাহরণই পেশ করা যেতে পারে।

কখন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব

একজন ইমামের তাকলীদ করার বিষয়টিও এই মূলনীতির আলোকেই কিয়াস করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করাটা কখনো ওয়াজিব থাকে। আবার কখনো ওয়াজিব থাকে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে ঃ ভারতবর্ষ কিংবা ইউরোপ বা আমেরিকায় যদি কোনো জাহিল মুসলমান বর্তমান থাকে আর সেখানে মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের কোনো আলিম বা গ্রন্থ না থাকে, তবে এ ব্যক্তির জন্যে আবু হানীফার মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং এ মাযহাবের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ, এমতাবস্থায় সে এই মাযহাবের বন্ধন থেকে বেরিয়ে পড়লে, ইসলামের বন্ধন থেকেই মুক্ত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি মক্কা বা মদীনায় অবস্থানকারী হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা, সেখানে সকল মাযহাব সম্পর্কে অবগত হওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ।

ইজতিহাদে মতলক

(এবার ইজতিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। ইজতিহাদ মূলত দুই প্রকার। এক ঃ ইজতিহাদে মতলক, দুই ঃ ইজতিহাদে মুকাইয়্যাদ।) মুজতাহিদ মতলক হচ্ছেন তিনি, যিনি পাঁচ প্রকার জ্ঞানে দক্ষতা রাখেন। ইমাম নববী তাঁর 'আল মিনহাজ' গ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"কাযী হবার শর্তাবলী হলো ঃ ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে। বালেগ ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। স্বাধীন হতে হবে। পুরুষ হতে হবে। ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। ফায়সালা কার্যকর করার মতো শক্তিমান হতে হবে সর্বোপরি তাকে মুজতাহিদ হতে হবে। আর মুজতাহিদ ঐ ব্যক্তিই হতে পারেন ঃ

১। যিনি কিতাব ও সুন্নাহর বিধান সংক্রান্ত অংশগুলোর উপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাছাড়া ঐসব বিধানের খাস্, আম, মুজমাল, মুবাইয়্যান, নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন।

২। যিনি বর্ণনাগত দিক থেকে হাদীসসমূহের মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহিদ, মুত্তাসিল ও মুরসাল হবার অবস্থা এবং শক্তিশালী ও দুর্বল রাবী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

৩। যিনি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ উভয় দিক থেকেই আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য রাখেন।

৪। যিনি সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমগণের ব্যাপারে এ খবর রাখেন যে, তাঁরা কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আর কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের মতপার্থক্য ছিলো।

৫। যিনি কিয়াসের তাৎপর্য ও তার সকল প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

মুজতাহিদ মতলকের প্রকারভেদ

ইজতিহাদে মতলক সম্পর্কে জানার পর যে জিনিসটি জানা দরকার তা হলো, 'মুজতাহিদ মতলক' দু'রকম হয়ে থাকেন। এক, 'মুজতাহিদ মতলক মুস্তাকিল।' দুই 'মুজতাহিদ মতলক মুন্তাসিব'।

মুজতাহিদ মতলক মুস্তাকিল এবং তার বৈশিষ্ট্য

এমন এক ইসলামী বিশেষজ্ঞকে 'মুজতাহিদ মতলক মুস্তাকিল' (স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ) বলা হয়, যাঁর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং সেগুলো এতোটা বিশেষভাবে বিদ্যমান যে, সেগুলো তাঁকে অন্য সকল ইজতিহাদের অধিকারী লোকদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। যেমন, তোমরা শাফেয়ীকে দেখতে পাচ্ছো, যাঁর মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সেই বৈশিষ্ট্য তিনটি হলো ঃ

এক ঃ তিনি নিজেই ফিকহী মাসায়েল ইস্তিম্বাত করার উসূল ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করবেন।[৬৭] যেমন শাফেয়ীর 'আল উম্ম' গ্রন্থের প্রথম দিকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী আলিম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের পদ্ধতি আলোচনা করে তাঁদের কিছু কিছু উসূলের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর সেই বক্তব্যটির মধ্যেও আমার একথার সমর্থন রয়েছে, যে বক্তব্যটি আমার উস্তাদ শাইখ আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম মাদানী তাঁর নিম্নোক্ত মাক্কী শাইখগণের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। সূত্রটি হলো ঃ শাইখ হাসান ইবনে আলী আজমী> শাইখ আহমদ নখলী> শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আ'লা বাহেলী> ইব্রাহীম ইবনে ইব্রাহীম লাক্কানী> আবদুর রউফ তাবলাবী জালাল> আবু ফদল সুয়ূতী> আবুল ফদল মারজানী> আবুল ফরজ গয্যী> ইউনুস ইবনে ইব্রাহীম দবূসী> আবুল হাসান ইবনুল বকর> ফদল ইবনে সাহল ইসফ্রাইনী> হাফিযুল হুজ্জাত আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী আল খতীব> আবু নুয়ীম আল হাফিয আবু মহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ইবনে হাব্বান> আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব আবু হাতিম অর্থাৎ রাযী ইউনুস ইবনে আবুল আ'লা মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী। তিনি (শাফেয়ী) বলেন ঃ

"মূল (উৎস) হচ্ছে, কুরআন এবং সুন্নাহ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহয় যদি সরাসরিভাবে কোনো মাসআলা পাওয়া না যায়, তবে সেগুলোর ভিত্তিতে কিয়াস করতে হবে। কোনো হাদীসের সনদ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছে এবং তা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে সেটাই 'সুন্নাহ'। খবরে মুফরাদের চাইতে ইজমা' অধিকতর

---

৬৭. অর্থাৎ উসূলে ফিকাহ প্রণয়ন করবেন। –অনুবাদক

শক্তিশালী। হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা উচিত। কোনো হাদীস যদি একাধিক অর্থবহ হয়, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থই গ্রহণ করা উচিত, যা হাদীসটির বাহ্যিক দিকের নিকটতর। যদি একই বিষয়ে (মতবিরোধপূর্ণ) কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ঐ হাদীসটিকেই বিশুদ্ধতম মনে করতে হবে, যেটির সনদ বিশুদ্ধতম। মুনকাতি' হাদীসের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণিত (মুনকাতি) হাদীসগুলো অবশ্যি গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তের কোনো মূলভিত্তিকে অপর মূলভিত্তির উপর কিয়াস করা যাবে না। এটা 'কেন হলো' 'কেমন করে হলো'— শরীয়তের কোনো মূলভিত্তির ব্যাপারে এ ধরনের কোনো কথা বলা যাবে না। তবে প্রাসংগিক (ফরুআত) বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা বলা যাবে। আর কিয়াসের প্রয়োজন তো প্রাসংগিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

সুতরাং কোনো মূলভিত্তির নিরিখে কোনো প্রাসংগিক বিষয়ের কিয়াস যদি সঠিক হয়, তবে সে প্রাসংগিক বিধান সহীহ এবং হুজ্জত হিসেবে স্বীকৃত হবে।"

দুই ঃ তিনি সাধ্যানুযায়ী 'হাদীস' এবং 'আছারের' একটা বড় ভাণ্ডার সংগ্রহ করবেন। এগুলোর ভেতর থেকে যেসব বিধান পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো জেনে নেবেন। এগুলোর মধ্যে কোন্ হাদীসগুলো ফিকাহ্র উৎস। সেগুলো পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করবেন। ইকতিলাফপূর্ণ হাদীসগুলোর মধ্যে সমতা বিধান করবেন এবং দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবেন। কোনো হাদীস যদি একাধিক অর্থবহ হয় সেটির একটি অর্থ নির্ণয় করবেন। (এগুলো বিরাট যোগ্যতার ব্যাপার) এমনকি আমার মতে এই বৈশিষ্ট্যটি ইমাম শাফেয়ীর দুই তৃতীয়াংশ ইল্মের সমতুল্য। তবে আল্লাহই অধিক জানেন।

তিন ঃ তিনি তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা দ্বারা তাঁর সামনে আসা সমস্ত মাসআলার জবাব দিতে সক্ষম হবেন, যেগুলোর জবাব তাঁর পূর্বে কেউই দিয়ে যাননি।

মোটকথা, মুজতাহিদ মতলক মুসতাকিল তিনিই হতে পারেন, যিনি এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এতোটা দক্ষতা, পারদর্শিতা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী যে, এ ময়দানে তিনি অন্যদের ছাড়িয়ে অনেক দূরত্বে এগিয়ে গেছেন।

উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও চতুর্থ একটি বিষয় আছে। তা হলো, উর্ধ্বজগত থেকে তার পক্ষে সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা নাযিল হতে হবে আর তা হবে এভাবে যে, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, উসূল বিশেষজ্ঞগণ এবং ফিকাহ গ্রন্থাবলীর হাফিযগণ দলে দলে তাঁর ইল্মের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে পড়বে। আর এই

সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পরবর্তীতে যুগের পর যুগ চলতে থাকবে। এমনকি মানুষের অন্তরের গহীনে এই গ্রহণযোগ্যতা শিকড় গেড়ে নেবে।[৬৮]

মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব

'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' (স্বাধীন সম্পর্কযুক্ত মুজতাহিদ) বলা হয় তাঁকে যিনি উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত ধরনের কোনো মুজতাহিদকে অনুসরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তিনি নিজেই। এ দুটির ক্ষেত্রে ইমামের তাকলীদের পরিবর্তে নিজেই তাঁর মতো স্বতন্ত্র অবদান রাখেন।

মুজতাহিদ ফীল মাযহাব

মুজতাহিদ ফীল মাযহাব বা মাযহাবী মুজতাহিদ হলেন তিনি, যিনি উল্লিখিত তিনটি শর্তের দুইটির ক্ষেত্রে ইমাম মুজতাহিদকে তাকলীদ করেন। তবে তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কিছুটা স্বতন্ত্র অবদান রাখেন। অর্থাৎ ইমাম মুজতাহিদের পন্থা অনুসরণ করে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেন। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

এখন আমাদের যুগে যারা চিকিৎসকের কাজ করেন, তারা হয় প্রাচীন ইউনানী চিকৎসকদের প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী চিকিৎসা করেন, না হয় প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকদের অনুসরণে চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে এই প্রাচীন ইউনানী (গ্রীক) বা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ (যাদের প্রদর্শিত পন্থায় বর্তমান কালের চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন) মুজতাহিদ মতলক মুসতাকিলের মতো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ।

এখন আমাদের কালের এই চিকিৎসকদের দুইটি অবস্থা হতে পারে। একটা অবস্থা এই হতে পারে যে, তারা ঔষধের বিশেষত্ব, গুণপ্রকৃতি এবং রোগের উৎস ও শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন চিকিৎসকগণ যে পথ ও পদ্ধতি প্রদর্শন করে গেছেন, তা অনুসরণ করে তারা এই শাস্ত্রবিদ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। প্রাচীন চিকিৎকদের মতো নিজেরাও এতোই

---

৬৮. এই চতুর্থ বিষয়টি একজন মুজতাহিদ মতলক মুসতাকিলের জন্যে প্রয়োজন বটে, কিন্তু শর্ত নয়। প্রথম তিনটি এ যোগ্যতার অপরিহার্য শর্ত। এ জন্যেই গ্রন্থাকার চতুর্থটিকে পয়লা তিনটি থেকে পৃথক করে আলোচনা করেছেন। –অনুবাদক

বুৎপত্তি অর্জন করেছেন যে, তারা তাদের অনুসরণ ছাড়াই রোগের এমনসব প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, কারণ ও শ্রেণীবিন্যাস নির্ণয় করেন, যা প্রাচীন চিকিৎসকরা আলোচনাই করে যাননি। তাছাড়া এ পর্যায়ে প্রাচীনদের অনুসরণ ছাড়াই তারা রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী ঔষধ তৈরী ও চিকিৎসার ফর্মূলা স্থির করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে তারা প্রাচীন চিকিৎসকদের সাথে মতপার্থক্য করেন। তাদের ফর্মূলাকে ভুল প্রমাণ করে নিজেরা নতুন ফর্মূলাও প্রদান করেন। এ মতপার্থক্য সীমিত পরিসরেও হতে পারে আবার ব্যাপক পরিসরেও হতে পারে। এইরূপ চিকিৎসকদের মর্যাদা হলো মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিবের মতো।

আমাদের কালের এই চিকিৎসকদের আরেকটি অবস্থা এই হতে পারে যে তারা চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রাচীন চিকিৎসকদের মতামত ও ফর্মূলা মেনে চলেন। তবে তাদের আসল দক্ষতা হলো, তারা প্রাচীন চিকিৎসকদের ফর্মূলা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করেন। এইরূপ চিকিৎসকদের মর্যাদা হলো মুজতাহিদ ফীল মাযহাব বা মাযহাবী মুজতাহিদের মতো।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের যুগে যারা কবিয়ালী করে, তারা কবিতার মাত্রা, ছন্দ, অনুপ্রাস ও স্টাইলের ক্ষেত্রে হয় প্রাচীন আরব কবিদের অনুসরণ করে, না হয় প্রাচীন অনারব কবিদের। এক্ষেত্রে এই প্রাচীন আরব বা অনারব কবিদের মর্যাদা হলো, মুজতাহিদ মতলক মুস্তাকিলের মতো।

এখন আমাদের যুগের এই কবিদের দুইটি অবস্থা হতে পারে। এদের মধ্যে যারা কবিতার মাত্রা, ছন্দ, অনুপ্রাস ও স্টাইলের ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের বেঁধে দেয়া নিয়মের মধ্য আবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ এসব ক্ষেত্রে নিজেরাও নতুন নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করে। মাত্রা, ছন্দ, অনুপ্রাস ও স্টাইলের ক্ষেত্রে তারা এমন এমন অভিনব নিয়ম-পন্থা তৈরী করে নেয়, যা অতীতের কেউ চিন্তাও করেননি। যেমন দুই দুই বা চার চার পংক্তির কবিতা, কিংবা অন্তমিল বা বেমিল পংক্তির কবিতা। এরূপ কবিদের মর্যাদা হলো, মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিবের মতো। পক্ষান্তরে এদের মধ্যে যেসব কবি কেবল ঐ প্রাচীন কবিদের রীতিনীতিকেই অনুসরণ করে, তাদের মর্যাদা হলো, মুজতাহিদ ফীল মাযহাবের মতো। ইল্‌মে তাফসীর, ইল্‌মে তাসাউফ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদাহরণ প্রযোজ্য।

প্রাচীনরা উসূলে ফিকাহ্ সংকলন করেননি কেন?

এ পর্যায়ে তোমরা যদি আমাকে প্রশ্ন করো, প্রাথমিক যুগের আলিমগণ উসূলে ফিকাহ সংকলন করে যাননি কেন? এমনকি তারাতো এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতও করে যাননি। অতপর ইমাম শাফেয়ীর প্রকাশ ঘটে। তিনি উসূলে

ফিকাহ্ প্রণয়ন ও সংকলন করে যান যা পরম কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো তাঁর পূর্বেকার মুজতাহিদগণ কেন এ বিষয়ে হাত দেননি?

এর জবাবে আমি বলবো, প্রাচীন আলিমগণের প্রত্যেকের কাছে কেবল নিজ নিজ শহরের লোকদের বর্ণিত হাদীস এবং আছারই বর্তমান ছিলো। সকল শহরের সম্মিলিত বর্ণনাসমূহ কোনো একজনের নিকট সঞ্চিত ছিল না। এ কারণে কোনো বড় ধরনের মতপার্থক্যের সম্মুখীন তাদের হতে হয়নি। নিজ শহরের বর্ণনাসমূহের মধ্যে যদি কখনো কোনো মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যেতো, সেক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তার মধ্যে সমতা বিধান করতেন। অতপর শাফেয়ীর যুগ আসে। এসময় পর্যন্ত সকল শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাদীস ও আছারসমূহ এবং বিভিন্ন শহরের ফকীহদের রায়ের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে বহু মতপার্থক্য ছিলো জটিল ধরনের। প্রত্যেক শহরের লোকেরা নিজ নিজ শাইখদের বর্ণিত হাদীস, আছার ও রায়কেই সঠিক মনে করেছিল। ফলে ইখতিলাফ আরো জটিলতর ও ব্যাপকতর হয়ে পড়ছিল। ইফতিলাফের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা এসব ইফতিলাফের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এর থেকে বেরুবার কোনো পথ পাচ্ছিলনা। অতপর তাদের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য এলো। শাফেয়ীর অন্তরে এমন কিছু উসূল ও নিয়ম বিধান ইলহাম করে দেয়া হয়, যেগুলোর সাহায্যে তিনি বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। ফলে পরবর্তী লোকদের এ পথে চলার পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়ে যায়।

চার মাযহাবের ইজতিহাদের ইতিহাস

১। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর আবু হানীফার মাযহাবে 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' আবির্ভাব হবার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায় কারণ, হানাফী আলিমরা আগে পরে সবসময়ই হাদীসশাস্ত্রের সাথে খুব কমই সম্পর্ক রাখতেন ও রাখছেন। আর হাদীসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া ছাড়া একজন আলিম কোনো অবস্থাতেই 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' হতে পারে না। তবে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর এ মাযহাবে 'মাযহাবী মুজতাহিদ' (মুজতাহিদ ফীল মাযহাব)-এর আবির্ভাব ঘটে। আর যিনি মুজতাহিদ হবার ন্যূনতম শর্ত 'মাবসূত' গ্রন্থটি মুখস্থ থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি মূলত মাযহাবী মুজতাহিদের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

২। মালিকী মাযহাবেও মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব খুব কমই হয়েছেন। আর কেউ এ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকলেও তাঁর ইজতিহাদী রায়সমূহকে মালিকী মাযহাবের মত বলে গণ্য করা হয় না। যেমন কাযী আবু বকর ইবনে আরবী এবং

আল্লামা ইবনে আবদুল বার নামে খ্যাত আবু উমার।

৩। আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব প্রথম দিকেও খুব একটা সম্প্রসারিত হয়েছিল না, আর এখনো তা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মাযহাবে 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' পয়দা হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতা নবম হিজরী শতাব্দীতে এসে শেষ হয়। এর পরে এসে অধিকাংশ স্থানেই এ মাযহাবের কর্তৃত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। তবে মিসর ও বাগদাদে এখনো এ মাযহাবের কিছু অনুসারী রয়েছে, যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

আসলে আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব সেরকম ভাবেই শাফেয়ীর মাযহাবের সাথে সমন্বিত হয়ে আছে, যেমনটি সমন্বিত হয়ে আছে আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদের মাযহাব আবু হানীফার মাযহাবের সাথে। তবে, শেষোক্ত দু'জনের মাযহাবের মতো আহমাদের মাযহাব শাফেয়ীর মাযহাবের সাথে একত্রে সংকলিত হয়নি। একারণেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দু'জনের মাযহাবকে এক মাযহাব গণ্য করা হয় না। অন্যথায় উভয় মাযহাবকে মনোযোগের সাথে অধ্যয়নকারীর পক্ষে দু'টিকে একটি মাযহাব হিসেবে (মানা) ও সংকলন করা মোটেও কঠিন নয়।

৪। বাকী থাকলো শাফেয়ীর মাযহাব। মূলত এ মাযহাবেই সর্বাধিক 'মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব' ও মুজতাহিদ ফীল মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। এখানেই সর্বাধিক আবির্ভাব ঘটে উসূল ও ইল্‌মে কালাম বিশেষজ্ঞদের। কুরআনের মুফাসসির এবং হাদীসের ব্যাখ্যাতাদেরও আবির্ভাব ঘটে এখানে সর্বাধিক। এ মাযহাবের রেওয়ায়েত ও সনদসমূহও অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় সর্বাধিক মজবুত। এর ইমামের মতামতসমূহ সর্বাধিক মজবুতভাবে সংরক্ষিত। ইমামের এবং আস্‌হাবুল উজূহ'র বক্তব্য এখানে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মত ও বক্তব্যের একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মনযোগ দেয়া হয়েছে।

এই কথাগুলো সেইসব লোকদের অজানা নয়, যারা উপরোক্ত মাযহাবসমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন করেছেন এবং একটা দীর্ঘসময় এর পিছে লেগে থেকেছেন।

শাফেয়ীর প্রথম দিককার ছাত্ররা সবাই মুজতাহিদ মতলক (মুনতাসিব) ছিলেন। তাদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না, যিনি তাঁর (শাফেয়ীর) সকল ইজতিহাদের তাকলীদ করতেন। অতঃপর ইবনে সুরাইজের যামানা এলো। তিনি তাকলীদ ও তাখরীজের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁর শিষ্যরা তাঁর দেখানো পথে চলতে থাকে। এ হিসেবেই তাঁকে সেই মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়,

প্রতি শতাব্দীর মাথায় যাদের আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময়কাল ধরে মাযহাবসমূহের বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর কাছে একথাও গোপন থাকতে পারে না যে, যেসব হাদীস ও আছারের উপর শাফেয়ীর মাযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত। এ কথাগুলো সকল আহলে ইলমেরই জানা এবং এগুলো থেকে তারা উপকৃতও হয়েছেন। এটা এই মাযহাবের এমন একটা মর্যাদা, যা আর কোনো মাযহাবই লাভ করতে পারেনি। এই সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যেগুলোর উপর শাফেয়ী মাযহাবের ভিত প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর একটি হলো মুআত্তা, যা নাকি শাফেয়ীর অনেক আগেই সংকলিত হয়েছে। শাফেয়ী এই গ্রন্থটিকে তার মাযহাবের ভিত হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যান্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঃ সহীহ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মুসনাদে শাফেয়ী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে দারু কুতনী, সুনানে বায়হাকী এবং বগবীর শরহুস সুন্নাহ।

অধিকাংশ ফিকহী ব্যাপারে ঐকমত্য থাকার কারণে যদিও বুখারীকে শাফেয়ীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত (মুনতাসিব) করা হয়, তবুও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক বিষয়ে তিনি আবার শাফেয়ীর সাথে মতপার্থক্যও করেছেন। সে কারণে যেসব মাসায়েলে তিনি শাফেয়ীর সাথে মতপার্থক্য করেছেন, সেগুলো শাফেয়ী মাযহাবের বলে গণ্য হয় না।

আবু দাউদ এবং তিরমিযী তারা দু'জনই মুজতাহিদ মতলক মুনতাসিব। তবে তাদের ইনতেসাব আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহুইয়ার প্রতি। ইবনে মাজাহ এবং দারেমীর অবস্থাও তাদের অনুরূপ।

আর মুসলিম, মুসনাদে শাফেয়ীর সংকলক আব্বাসুল আসাম এবং অন্য যাদের কথা উল্লেখ করেছি এরা সবাই এককভাবে শাফেয়ীর অনুসারী।

এ যাবত আমি যা কিছু আলোচনা করলাম, তার মর্ম যদি তুমি উপলব্ধি করে থাকো, তবে অবশ্য তোমার কাছে এ সত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজতিহাদে মতলক থেকে বঞ্চিত হবে, যে শাফেয়ীর মাযহাবের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। আর যে ব্যক্তি শাফেয়ী এবং আসহাবে শাফেয়ীর ইলমী ফয়েজ থেকে বিমুখ তার কর্মকাণ্ড মূলত হাদীসের ইলম অস্বীকারেরই নামান্তর।

১১. চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পর ফিক্‌হী মতপার্থক্য

ফিতনার যুগ এলো

এ যাবত যাদের কথা আলোচনা করলাম, অতপর তাঁদের সময়কাল অতীতের কোলে পাড়ি জমায়। তাঁদের পরে আবির্ভাব ঘটে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের। এই নতুন প্রজন্ম ডানে বামে যেতে থাকে। (তাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের বিপ্লব ঘটে)। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যেসব ধ্বংসাত্মক রোগ তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, সেগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. ফিকহী বিবাদ

পহেলা বিপর্যয়টি ছিলো ফিকাহ শাস্ত্রে বিবাদ বিরোধকে কেন্দ্র করে। গাযালীর (রহ) কলমে এর বিস্তারিত রূপ অবলোকন করুন ঃ

"খুলাফায়ে রাশেদীন আল মাহ্‌দীয়ীন-এর যুগ শেষ হবার পর খিলাফতের বাগডোর এমন সব লোকের হাতে এসে পড়ে, এ মহান দায়িত্ব পালনে যাদের না যোগ্যতা ছিলো আর না ফতোয়া ও আহকামে শরয়ীর ক্ষেত্রে বুৎপত্তি ছিলো। তাই ফতোয়া দান, বিচার ফায়সালা প্রদান ও শরয়ী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তারা ফকীহ্‌দের সাহায্য নিতে এবং সবসময় তাদেরকে সাথে রাখতে বাধ্য হয়। 'আইরুল কুরূন'-এর যুগ যদিও শেষ হয়ে গেছে, তবুও তখন পৃথিবী এমন সব আলিম থেকে শূন্য ছিল না, যারা প্রাথমিক যুগের আলিমদের মতোই ছিলেন বলিষ্ঠচিত্ত ও প্রকৃত দীনের বাহক। শাসকরা এঁদের কাছে টানতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা যতোই এঁদের কাছে টানতে চেষ্টা করতো, তাঁরা ততোই তাদের থেকে দূরে সরে যেতেন। আলিমদের এরূপ সম্মান ও মর্যাদা অবলোকন করে পদলোভী লোকেরা সরকারী পদ ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে দীনি ইল্‌ম হাসিল করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে শাসকরা আলিমদের খুঁজে বেড়ানোর পরিবর্তে আলিমরাই শাসকদের পিছে ঘুরতে থাকে। এতোদিন শাসকরা তাঁদের মুখোপেক্ষী থাকার কারণে তাঁরা ছিলেন মর্যাদাবান। আর এখন শাসকদের নিকট পদমর্যাদা চাইতে গিয়ে তারা লাভ করলেন সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা আর অসম্মান। তবে দু'চারজনের কথা আলাদা। এদের আগেকার একদল লোক ইল্‌মে কালাম (তর্কশাস্ত্র)-এর উপর অনেক কিছু লিখে গেছে। তারা যুক্তি তর্কের ঝড় সৃষ্টি করে গেছে। অভিযোগ এবং জবাবের বাজার গরম করে রেখে গেছে। বাহাছ ও মুনাযিরার পথ প্রশস্ত করে রেখে গেছে। ফলে আলোচ্য ফকীহ্‌রা

এগুলোর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিলো। এ সময় এমন কিছু রাজা বাদশাহ্রও জন্ম হয়, যারা ফিকহী বাহাছ ও মুনাযিরার প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অমুক মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ কিংবা অমুক মাসআলার ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাব সেরা প্রভৃতি তথ্য জানার জন্যে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা কালাম শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের ইল্মী গবেষণা ত্যাগ করে আবু হানীফা ও শাফেয়ীর (রহ) মাযহাবের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে। বিশেষভাবে এ দু'টি মাযহাবকে তর্ক-বাহাছের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়। এদিক থেকে তারা মালিক, সুফিয়ান এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবকে কিছুটা ছাড় দেয় (কারণ শাসকদের আকর্ষণ ছিলো বিশেষভাবে উক্ত দু'টি মাযহাবের প্রতিই)।

তাদের ধারণা ছিলো, এভাবে তারা শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহ উদঘাটন করছে, প্রতিটি মাযহাবের ভাল-মন্দ দিকসমূহ নির্ণয় করছে এবং ফতোয়ার নীতিমালার পথ প্রশস্ত করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা রচনা করে বহু গ্রন্থাবলী, উদ্ভাবন করে বহু বিষয়াদি, নিত্যনতুন আবিষ্কার করে বাহাছ ও বিবাদের অসংখ্য হাতিয়ার। বড়ই আফসোসের বিষয়, তারা এইসব কার্যক্রম এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। এসব তৎপরতা যে ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন।"

২. মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা

শুনো, আমি এদের অধিকাংশকেই এ ধারণা পোষণ করতে দেখেছি যে আবু হানীফা ও শাফেয়ীর মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ হলো সেসব উসূল, যেগুলো বয়দুবী প্রমুখের গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, সেসব উসূলের অধিকাংশই সম্মানিত ইমামদ্বয়ের মতামতের আলোকে পরবর্তীকালে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন, আমার মতে নিম্নোক্ত ফিকহী উসূলগুলো ইমামদের বক্তব্যের আলোকে পরবর্তী লোকেরা নির্ণয় করেছে ঃ

১. 'খাস্'-এর বিধান সুস্পষ্ট। তার সাথে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না।

২. কোনো বিধানের উপর পরিবর্ধন রহিত।

৩. 'খাস্'-এর মতো 'আম'ও অকাট্য দলিল।

৪. বর্ণনাকারীদের আধিক্য অগ্রাধিকারের জন্য অনিবার্য নয়।

৫. ফকীহ্ নয় এমন রাবীর রেওয়ায়েত কিয়াসের বিপরীত হলে তা গ্রহণ

করা আবশ্যকীয় নয়।

৬. 'মাফহুম শর্ত' এবং 'মাফহুম ওয়াস্‌ফ'-এর কোনো ব্যাখা নেই।

এ ক'টি এবং এ রকম আরো অনেক ফিক্‌হী উসূল হানাফী ইমামদের কর্তৃক নির্ধারিত নয়। বরঞ্চ তাদের ফতোয়ার আলোকে পরবর্তী লোকেরা এগুলো নির্ণয় করেছে। আবু হানীফা এবং তাঁর দুই সাথী (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) কর্তৃক এগুলি নির্ধারিত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণিত রেওয়ায়েত নেই। এখন এসব উসূলের হিফাযত করতে গিয়ে এবং এগুলোর উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে লোকেরা যা করছে তা নিতান্তই অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই ঃ

১. এই পরবর্তী আলিমরা তো হানাফী ফিকাহ্‌র এইসব উসূল নির্ধারণ করলো যে ঃ "খাস-এর বিধান সুস্পষ্ট। তার সাথে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না।" কিন্তু উসূলটি পূর্ববর্তী আলিমগণের দৃষ্টিভংগির বিপরীত। 'ওয়াসজুদু ওয়ারকাউ (রুকু করো, সিজদা করো)'— কুরআনের এই আয়াত এবং "ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির নামায হয় না, যতোক্ষণ না সে রুকু এবং সিজদায় পূর্ণভাবে নিজের পিঠকে স্থির করবে"—রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) এই হাদীসের বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিভংগি ছিলো তাদের দৃষ্টিভংগির বিপরীত। পূর্ববর্তীরা হাদীসটিকে আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এরা উল্লিখিত উসূলের আলোকে হাদীসটিকে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করে কেবল রুকু সিজদাকেই ফরয বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং রুকু সিজদায় গিয়ে পিঠ স্থির করাকে ফরয ধরনেনি। পরবর্তীদের বক্তব্য হলো, তারা পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এই উসূলটি নির্ণয় করেছেন। অথচ দেখো, পূর্ববর্তীদের অনেক মাসায়েলের সাথেই তাদের এই উসূল সাংঘর্ষিক ঃ

'ওয়াম্‌সাহু বিরুউসিকুম[৬৯] (আর তোমাদের মাথাকে মসেহ্‌ করো)' আয়াতে শুধুমাত্র মাথা মসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে (কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি)। কিন্তু পূর্ববর্তী আলিমগণ নবী করীমের (সা) কপাল মসেহ্‌ করাকে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এক-চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করাকে ফরয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

---

৬৯. সূরা আল মায়িদা ঃ ৬

একইভাবে ঃ "ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিনী এদের প্রত্যেককে একশ' কোড়া মারো"[৭০], "চোর পুরুষ এবং চোর নারীর হাত কেটে দাও"[৭১] এবং "যতোক্ষণ না সে (নারী) অপর কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়"[৭২] প্রভৃতি আয়াতে 'খাস' শব্দ বিদ্যমান। কিন্তু পূর্ববর্তীগণ এসব 'খাস'-এর বিধানের ক্ষেত্রে হাদীসকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এ আয়াতগুলোর বিধান প্রসঙ্গে যেসব হাদীস এসেছে, তারা সেগুলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৭৩] অতপর এখন যখন এর ভিত্তিতে পরবর্তীদের বানানো ফিকহী উসূলের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তখন তারা এর জবাবে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে থাকে, যার বিস্তারিত বিবরণ তাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে দেখা যেতে পারে।

২. নামাযের কিরআত সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "যতোটা কুরআন সহজে পাঠ করতে পারো, পড়ো।"[৭৪] কিন্তু হাদীসে বলা হয়েছে "লা-সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব— সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই।"[৭৫] "যতোটা সহজে পড়া যায়" কথাটি 'খাস', কিন্তু এই হাদীসটি তার ব্যাখ্যা। হাদীসটির দাবী অনুযায়ী প্রত্যেক রাকায়াতে 'ফাতিহা' পড়া ফরয।

একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "নদী নালা ও খাল বিলের পানিতে (সেচের পানি ছাড়াই) যে ফসল জন্মে, তার যাকাত এক দশমাংশ।"[৭৬] অথচ অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "পাঁচ ওয়াসকের কম ফসলের যাকাত নেই।"[৭৭]

---

৭০. সূরা আন নূর ঃ ২

৭১. সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৮

৭২. সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০

৭৩. এসব আয়াতে "ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিনী", "চোর পুরুষ এবং চোর নারী", "বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়" শব্দগুলো খাস। এখানে ব্যভিচার, চুরি এবং হীল্লা বিবাহের বিধান দেয়া হয়েছে। এটা বিবাহিত নাকি অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি, সে কথা বলা হয়নি। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে চোরের এ শাস্তি হবে তা বলা হয়নি। এবং বিবাহের পর স্বামীর সাথে যৌনসংগম করতে হবে, সে কথা এখানে বলা হয়নি। এই ব্যাখ্যাগুলো হাদীসে রয়েছে। –অনুবাদক

৭৪. সূরা আল মুযযাম্মিল ঃ ২

৭৫. জামে' তিরমিযী

৭৬. বুখারী ও মুসলিম

৭৭. মুআত্তা-ই ইমাম মালিক

এখানেও তারা পরবর্তী হাদীসটিকে পূর্ববর্তী হাদীসটির ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেননি।

অথচ "ফাইন উহ্‌সিরতুম ফামাস্‌তাইসারা মিনাল হাদ্‌ইয়ে– কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ো, তবে যে কুরবানীই সম্ভব তা খোদার উদ্দেশ্যে পেশ করো"[৭৮] —আয়াতটির ব্যাপারে যখন বলা হয় যে, পূর্ববর্তী আলিমগণ 'যে কুরবানীই সম্ভব' কথাটিকে অকাট্য ধরে নেননি। (কেননা তাঁরা যদি এটাকে তাঁদের নিয়মের ছাঁচে ঢালতেন, তাহলে বলতেন, এর অর্থ ছোট বড় যে পশুই সম্ভব কুরবানী করো)। কিন্তু সেটা না বলে তাঁরা হাদীসের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই কুরবানীর জন্যে ছাগলের চাইতে বড় কোনো পশু হতে হবে। তখন এই অভিযোগের জবাবে তারা (পরবর্তীরা) যতোসব অযৌক্তিক ও হাস্যকর জবাব দেন এবং এরূপ জবাবের উপর একগুঁয়েমী প্রদর্শন করেন।

৩. 'মাফহুম শর্ত এবং মাফহুম ওয়াস্‌ফের কোনো ব্যাখ্যা নেই'— এই উসূলটির ক্ষেত্রেও তারা একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এ উসূলটিও তাঁরা প্রাচীনদের অনুসৃত নীতি থেকেই গ্রহণ করেছেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, প্রাচীনরা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ঃ "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বংশীয় মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেনো তোমাদের মালিকানাভুক্ত মুমিন দাসীদের বিয়ে করে।"[৭৯] এ আয়াতে দাসী বিয়ে করার জন্যে 'অসামর্থ্যের' যে শর্তারোপ করা হয়েছে প্রাচীনগণ সে শর্ত উন্মুক্ত করে সামর্থবানদের জন্যেও দাসী বিয়ে করা বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

এভাবে পূর্ববর্তীদের আরো অনেক ফতোয়া উত্তরবর্তীদের এই উসূলের সাথে সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া, তুমি দেখবে, এই পরবর্তী হানাফীদের তাখরীজসমূহের মধ্যে রয়েছে বহু স্ববিরোধিতা। আরো দেখবে এমন অনেক তাখরীজ, যেগুলোর একটিকে আরেকটি রহিত করে দেয়।

৩. ফিক্‌হী মতামতের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা

আমি দেখতে পেয়েছি, এদের (হানাফীদের) কিছু লোক মনে করে ফিকাহ ও

---

৭৮. সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬ আয়াত

৭৯. সূরা আন নিসা ঃ ২৫ আয়াত

ফতোয়ার গ্রন্থাবলীতে যতো টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে সবই আবু হানীফা কিংবা সাহিবাইনের মতামত। মূল জিনিস আর তার তাখরীজের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না। 'কারখীর ফতোয়া অনুযায়ী বিষয়টি এরূপ' এবং 'তোহাবীর ফতোয়া অনুযায়ী এরূপ'—তারা যেনো এ ধরনের বাক্যগুলোকে অর্থহীন মনে করে। 'আবু হানীফা এরূপ বলেছেন' এবং 'এটি আবু হানীফার মাযহাবের মত' তাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আমি আরো দেখেছি, কিছুলোক মনে করে, আবু হানীফার মাযহাব সারাখ্সী প্রণীত মাবসূত এবং হিদায়া ও তিবঈন প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে ছড়িয়ে থাকা বিবাদমূলক বাহাছসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ তারা জানে না যে, তার্কিক বাহাছের ভিত্তির উপর তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের মধ্যে এরূপ বাহাছের সূত্রপাত করে আসলে মুতাযিলারা। ফলে পরবর্তী লোকেরা ধারণা করে বসে, ফিকহী আলোচনার মধ্যে হয়তো এরূপ কথাবার্তার অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া, এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনমস্তিষ্কেও তর্কবাহাছের তীক্ষ্ণতা স্থান করে নিয়েছে।

লোকদের এসব ধারণা কল্পনা ও সন্দেহ সংশয়ের প্রতিবিধানকল্পে এখানে আমি দীর্ঘ আলোচনা করতে চাই না। কারণ, এ অধ্যায়ের সূচনাতে আমি যে ভূমিকা দিয়েছিলাম, এর অধিকাংশের নিরসনের জন্যে তাই যথেষ্ট।

৪. 'রায়' এবং 'যাহেরিয়াত'-এর তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা

কিছু লোককে আমি এ ধারণাও পোষণ করতে দেখেছি যে, "মাত্র দু'টি ফিকহী গ্রুপই বর্তমান আছে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো গ্রুপ নেই। দু'টির একটি গ্রুপ হলো 'আহলুর রায়' আর অপরটি হলো 'যাহেরিয়া'। আহলুর রায় হলো সে গ্রুপ, যারা কিয়াস এবং ইস্তিম্বাত-এর সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে।" অথচ এ ধারণা একটা দারুণ অজ্ঞতা। 'রায়' মানে নিরেট বুঝ-বুদ্ধি (ফাহ্‌ম ও আকল)-ই নয়। কারণ কোনো আলিমই এ দুটি গুণবিহীন নন। এই 'রায়' সুন্নাতের রাসূলের সাথে সম্পর্কহীন 'রায়' নয়। কারণ, ইসলামের কোনো অনুসারীই সুন্নাতের সাথে সম্পর্কহীন রায় গ্রহণ করতে পারে না। 'রায়'-এর অর্থ নিরেট কিয়াস এবং ইস্তিম্বাতের যোগ্যতাও নয়।

আসলে, 'আহ্‌লুর রায়'-এর অর্থ এগুলো নয়। প্রকৃতপক্ষে 'আহ্‌লুর রায়' হলেন সেইসব লোক যাঁরা মুসলমানদের সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত মাসায়েলসমূহের প্রাসংগিক বিষয়াদি তাখরীজ করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন ইমাম মুজতাহিদদের নির্ণীত উসূলের ভিত্তিতে। তারা এ কাজ হাদীস এবং

আছারের ভিত্তিতে করেননি। বরং মুজতাহিদ ইমামদের নির্ণীত মাসায়েল সমূহের নজীর ও কার্যকারণকে সামনে রেখে করেছেন। পক্ষান্তরে 'আহলুয যাহের' বা 'যাহেরিয়া' হলেন তাঁরা, যারা কিয়াস বা সাহাবীগণের আছার এ দু'টির কোনোটিকেই অবলম্বন করেননি। যেমন, ইমাম দাউদ এবং ইবনে হাযম। এই উভয় গ্রুপের মাঝে রয়েছেন 'মুহাক্কিকীন' এবং 'আহলুস্ সুন্নাহ'। যেমন, আহমদ এবং ইসহাক।

৫. অন্ধ অনুকরণের প্রাধান্য

আরেকটি প্রধান বিপর্যয় হলো, এ সময় লোকেরা চরমভাবে অন্ধ অনুকরণে (তাকলীদে) নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এতোটা নিশ্চিন্তে তারা এ পথে অগ্রসর হয় যে, তা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে যায়। এর পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো কাজ করছিল ঃ

একটি কারণ ছিলো, ফকীহদের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ। ফলে, একজন ফকীহ যখন কোথাও কোনো ফতোয়া দিলেন, সাথে সাথে আরেকজন ফকীহ তা খণ্ডন করে, আরেকটি ফতোয়া দিয়ে বসেন। সে কারণে প্রত্যেকেই স্বীয় ফতোয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মুজতাহিদ ইমামদের (মতামতের) প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।

এ সময় শাসকদের যুলুমের কারণে মুসলমানগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে, তাদের নিয়োগকৃত কাজীদের প্রতিও জনগণ আস্থাশীল ছিল না। তাই, তারা বাধ্য হয়েই নিজেদের ফতোয়া-ফায়সালার পক্ষে ইমাম মুজতাহিদগণের মতামত দলিল হিসেবে পেশ করতো।

আরেকটি কারণ এই ছিলো যে, এ সময় সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা দীনি জ্ঞান লাভ থেকে ছিলেন অনেক দূরে। ফলে, লোকেরা ফতোয়া নেয়ার জন্যে এমনসব লোকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাদের না হাদীসের জ্ঞান ছিলো আর না তাখরীজ এবং ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা ছিলো। পরবর্তীকালের আলিমদের মধ্যে এ অবস্থা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো। ইমাম ইবনে হুমাম প্রমুখ এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এ সময় মুজতাহিদ নয় এমন লোকদেরও ফকীহ বলা হতে থাকে।[৮০]

---

৮০. সে সময় মুজতাহিদ নয় এমন লোকদের ফকীহ বলার কারণে গ্রন্থকার আফসোস করছেন। কিন্তু আমাদের কালে ফকীহ হবার জন্যে মুজতাহিদ হবার প্রয়োজন তো নেই-ই, বরঞ্চ

(অপর পৃষ্ঠায়)

এ সময় মানুষের মধ্যে ফিকহী বিষয়াদি নিয়ে বিদ্বেষ এবং রেষারেষিও ছড়িয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে ফকীহদের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তার অধিকাংশই মাযহাবীগণের মতামতের বিভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর, দুই ঈদের তাকবীর, মুহ্‌রেমের (ইহ্‌রামকারীর) বিয়ে, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাসউদের তাশাহ্‌হুদ, নামাযে বিস্‌মিল্লাহ এবং আমীন সশব্দে বা নিঃশব্দে বলা প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে এগুলোর সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে যে মতপার্থক্য ছিলো, তা ছিলো নেহাতই অগ্রাধিকারের ব্যাপার। তাঁরা একটি মতকে আরেকটি মতের চাইতে উত্তম মনে করতেন। এর চাইতে বেশী কিছু নয়।

৬. শাস্ত্রীয় গবেষণার অপ্রয়োজনীয় হিড়িক

এ সময় আরেকটি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তা হলো, শরীয়তের আসল উৎসকে উপেক্ষা করে অধিকাংশ লোক বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

ফলে কেউ আসমাউর রিজাল এবং জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়ে ধারণা করে বসে, আমি এ বিষয়ের ভিত্তি মযবুত করছি। কেউ নিমজ্জিত হয় প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস গবেষণায়। কেউ নিমজ্জিত হয় বিরল, গরীব এমনকি মওদূ' হাদীসসমূহের যাচাই বাছাইর কাজে।

কেউ কেউ তাঁর গবেষণার ঘোড়া দৌড়ান উসূলে ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে। স্বীয় অনুসারীদের জন্যে আবিষ্কার করেন বিবাদ করার নিয়ম কানুন। অতপর অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের তুফান ছুটান। বীরদর্পে জবাব দেন অন্যদের অভিযোগের। প্রতিটি জিনিসের সংজ্ঞা প্রদান করেন। মাসআলা এবং বাহাছকে শ্রেণী বিভক্ত করেন। এভাবে এসব বিষয়ে দীর্ঘ হ্রস্ব গ্রন্থাদি রচনা করে যান।

অনেকে আবার এমনসব ধরে নেয়া বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা চালান, যেগুলো ছিলো নিতান্তই অনর্থক এবং কোনো জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেগুলোকে তাকিয়ে দেখারও যোগ্য মনে করে না।

এসব মতবিরোধ, ঝগড়া বিবাদ ও বাহুল্য গবেষণার ফিতনা ছিলো প্রায় সেই ফিতনার মতো, যার শিকার হয়েছিল মুসলমানরা তাদের প্রাথমিক যুগে। যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয় আর প্রত্যেকেই নিজ নেতাকে ক্ষমতাসীন

ইজতিহাদ করাকে নিষিদ্ধ মনে করা হয়। –অনুবাদক

করা বা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছিল। এর ফলে তখন যেমন মুসলমানদের উপর যালিম অত্যাচারী একনায়ক শাসকরা সওয়ার হয়ে বসেছিল এবং ইসলামের ইতিহাসের সবচাইতে ন্যাক্কারজনক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি এই নব ফিতনাও মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সন্দেহ-সংশয় ও ধারণা কল্পনার চরম ধ্বংসকারী ঝড় তুফান বইয়ে দেয়।

অতপর আসে এদের পরবর্তী জেনারেশন। এই জেনারেশন তাদের পূর্বসুরীদের অন্ধ অনুকরণ করে সম্মুখে ধাবিত হয়। ফলে, তারা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। ঝগড়া বাহাছ এবং সঠিক ইস্তিম্বাতের মধ্যে পার্থক্য করার চেতনাই তারা লাভ করেনি। এখন সেই ব্যক্তিই ফকীহ্ উপাধি পেতে থাকে যে বেশী বকবক করতে এবং জটিলতা পাকাতে পারে, যে কোনো বিষয়ে নীরব থাকতে এবং সত্য মিথ্যা যাচাই করতে জানে না এবং ফকীহ্দের দুর্বল ও মযবুত বক্তব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। একইভাবে এমনসব লোদেরকে মুহাদ্দিস বলা হতে থাকে, যারা সঠিক ও ভ্রান্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না এবং সঠিক ও ভ্রান্ত হাদীসকে সমানভাবে চালিয়ে দেয়।

সকলেরই এরূপ অবস্থা ছিলো, সে কথা আমি বলি না। আল্লাহ্র একদল বান্দাহ সব সময়ই তাঁর সন্তুষ্টির পথে কাজ করেছেন, কোনো শত্রুতা তাদেরকে এপথ থেকে ফিরাতে পারেনি। পৃথিবীতে এরাই আল্লাহ্র হুজ্জত।

অতপর এদের পরে যে জেনারেশনের আগমন ঘটে, তারা এদের চাইতেও বড় ফিতনাবাজ প্রমাণিত হয়। তারা বিদ্বেষমূলক তাকলীদের দিক থেকেও ছিলো অগ্রগামী। তাদের অন্তরে না ছিলো জ্ঞানের আলো আর না ছিলো অন্তরদৃষ্টি। তারা দীনি বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করাকে 'বিদআত' বলে আখ্যায়িত করে সদর্পে ঘোষণা দিয়েছে ঃ

"আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এভাবেই চলতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করতে থাকবো।"

এখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই এ বিষয়ে অভিযোগ করা যায়! তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। তিনিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সত্তা আর তাঁর উপরই ভরসা করা যেতে পারে।

১২. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়

ইসলাম এসেছিল ঐক্যের পয়গাম নিয়ে। কিন্তু অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর কবলে পড়ে সে আজ মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কতিপয় ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক মাযহাবী মাসআলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদের তুফান বইয়ে দেয়া হয়েছে। এসবের কারণ নিয়ে যখনই আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি, দেখতে পেয়েছি, প্রতিটি গ্রুপই সত্য ও ন্যায়ের কেন্দ্র থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুত হয়েছে। গোঁড়ামী এবং বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেকেই সত্যের অনুসারী বলে দাবী করেছে। কিন্তু সত্যের একনিষ্ঠ রাজপথে চলার পরিবর্তে তারা আবেগতাড়িত হয়েছে। আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে সঠিক সুষম ন্যায়-পন্থা জানার মানদণ্ড প্রদান করেছেন। তা দিয়ে আমি সত্য ও ভ্রান্তের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি। জানতে পারছি, সত্যের সরল সোজা রাজপথ কোনটি? আরো জানতে পারছি, লোকেরা এখন কোন্ ধরনের মতবিরোধসমূহের মধ্যে নিমজ্জিত? আর তাদের এসব মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদের ভিত্তি কি?

মুসলমানদের এই অবস্থা আমাকে দারুণ পীড়া দেয়। তাই তাদের সমস্যার সঠিক ধরন তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার। তাদের চিন্তা ও উপলব্ধির ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদের সাবধান করা দরকার। তারা এই ভ্রান্ত পথে মুখে এবং কলমের মাথায় যে বাড়াবাড়ি করছে, সে সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করা দরকার।

১. বিবাদের সবচাইতে বড় হাতিয়ারটি হলো তাকলীদ। চারজন ইমামের তাকলীদের ব্যাপারে প্রায় গোটা উম্মাত একমত। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা প্রায় সর্বসম্মতভাবে তাঁদের তাকলীদ করে আসছে। আর এতে যে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে, তাও সকলের চোখের সামনেই রয়েছে। বিশেষ করে কাল পরিক্রমায় লোকেরা যখন দীনি বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা পরিত্যাগ করে বসেছে, নিজ মতের পিছে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং নফসের ঘোড়ার পিছে দৌড়াচ্ছে।

তাকলীদ সম্পর্কে ইবনে হাযমের বক্তব্য ঃ "কুরআন এবং প্রাচীন আলিমগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকলীদ হারাম এবং মুজতাহিদ ইমামগণ স্বয়ং তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করে গেছেন"—লোকদের দারুণ ভুল বুঝাবুঝিতে নিমজ্জিত করেছে। তারা মনে করে বসেছে, কথাটা বুঝি সর্বশ্রেণীর মানুষের

জন্যেই প্রযোজ্য! কথাটি স্বয়ং সত্য কথা। তবে তা প্রযোজ্য হবে ক্ষেত্রবিশেষে। অর্থাৎ তাকলীদ নিষিদ্ধ তাদের জন্যে, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন অন্তত একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও। তাদের জন্যেও তাকলীদ করা নিষেধ, যারা সুস্পষ্টভাবে জানেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক কাজের হুকুম দিয়েছেন, অমুক কাজ নিষেধ করেছেন এবং অমুক হুকুম রহিত।' এ জ্ঞান তারা সরাসরি হাদীস অধ্যয়ন করে অর্জন করুক কিংবা অর্জন করুক দীনের সেরা আলিমদের আমল দেখে, তাতে কিছু যায় আসে না। এ সত্যের প্রতিই ইংগিত করেছেন শাইখ ইয্যুদ্দীন আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন ঃ

"ঐসব ফকীহ্দের অবস্থা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি, যারা স্বীয় ইমামদের ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সেই ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তা ত্যাগ করে কিতাব, সুন্নাহ ও কিয়াসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ মতকে গ্রহণ করে না। বরঞ্চ এসব অজ্ঞ অন্ধরা তাদের অন্ধ তাকলীদের ভ্রান্ত জজবায় অনেক সময় বাস্তবে কুরআন সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে চলে যায় এবং স্বীয় ইমামকে ত্রুটিহীন প্রমাণ করার জন্যে কুরআন সুন্নাহর এমন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যা কালামের তাহ্রীফ ছাড়া আর কিছু নয়।"

তিনি অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"প্রথম যুগের লোকেরা যে আলিমকেই সামনে পেতেন, তাঁর কাছেই ফতোয়া জেনে নিতেন। তিনি কোন্ খেয়াল ও মসলকের লোক, তা জানার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। চার মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। সেগুলোর অন্ধ অনুকরণকারীদের আগমন ঘটে। লোকেরা হিদায়াতের আসল উৎস থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল ইমামদের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের কোনো বক্তব্য যতোই দুর্বল ও দলিলবিহীন হোক না কেন। ভাবটা যেন এমন যে, মুজতাহিদরা মুজতাহিদ নন বরং আল্লাহ্র রাসূল, মাসূম এবং তাদের কাছে ওহী নাযিল হয়! এটা সত্য ও হকের পথ নয়। বরঞ্চ নির্ঘাত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির পথ।"

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামাহ্ বলেন ঃ

কেউ যদি ফিকাহ্র প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তিনি যেনো কোনো একটি মাযহাবকে যথেষ্ট মনে না করেন। বরঞ্চ প্রত্যেক মুজতাহিদের মতামত যেনো মনোযোগ দিয়ে দেখেন। প্রত্যেকের মধ্যে ডুব দিয়ে সত্যের বাতি জ্বালিয়ে দেখা উচিত। অতপর যে মতটিকে কুরআন সুন্নাহ্র অধিকতর কাছাকাছি মনে করবেন

সেটাই যেনো গ্রহণ করেন। প্রাচীন আলিমগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় অংশগুলোর প্রতি যদি তিনি নযর দেন, তবে ইনশাল্লাহ্ যাচাই বাছাইর এ শক্তি অর্জন করা তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে এবং সহজেই শরীয়তের সত্যিকার রাজপথের সন্ধান পেয়ে যাবেন। এরূপ লোকদের কর্তব্য হলো গোষ্ঠীগত গোঁড়ামী থেকে নিজেদের মন মস্তিষ্ককে পবিত্র রাখা। বিবাদ বিসম্বাদের ময়দানে একটি কদমও না ফেলা। কারণ সেখানে সময় নষ্ট করা এবং স্বভাব ও আচরণে বিকৃতি লাভ করা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইমাম শাফেয়ী তাঁর এবং অন্যদের তাকলীদ করতে লোকদের নিষেধ করে গেছেন। একথা বলেছেন শাফেয়ীর ছাত্র আল মুযনী তাঁর গ্রন্থ মুখতাসার-এর সূচনায়। ইবনে হাযমের মন্তব্য এমন সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারেও প্রযোজ্য, যে দীনি ইল্‌ম সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান না থাকার কারণে তাকলীদ করে বটে, কিন্তু কোনো একজন ফকীহ্‌র তাকলীদ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে করে যে, তিনি ভুল করেন না, তিনি যা বলেন সবই সঠিক। তাছাড়া দলিল প্রমাণের দিক থেকে তাঁর মত যতোই ভুল এবং বিপরীত মত যতোই বিশুদ্ধ হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই সে তাঁর তাকলীদের উপর জমে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত এ নীতি সেই ইহুদীবাদেরই অনুরূপ যা তাওহীদী আদর্শকে শিরকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি মুসলিম শরীফে আদী ইবনে হাতিম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইত্তাখাযু আহবারাহুম ওয়া রুহ্বানাহুম আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ্– তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা মাশায়েখদের রব বানিয়ে নিয়েছে।'[৮১] আয়াত পড়ে বলেছেন ঃ ইহুদীরা তাদের উলামা মাশায়েখদের ইবাদত করতো না বটে, কিন্তু তারা যখন কোনো জিনিসকে বৈধ বলতো। তারা সেটাকেই (নির্বিচারে) বৈধ বলে গ্রহণ করতো আর তারা তাদের জন্যে যেটাকে নিষিদ্ধ করতো, সেটাকেই অবৈধ বলে মেনে নিতো।"

সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একজন মাত্র ইমামের তাকলীদ করা যে, তিনি শরীয়তের নির্ভুল মুখপত্র– তার পূজা করারই সমতুল্য।

ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবনে হাযমের ফতোয়া প্রযোজ্য, যে মনে করে, কোনো হানাফীর জন্যে শাফেয়ী ফকীহর কাছে এবং কোনো শাফেয়ীর জন্যে হানাফী

---

৮১. সূরা তাওবা আয়াত ঃ ৩১

ফিকাহ্র নিকট ফতোয়া চাওয়া বৈধ নয়, কিংবা হানাফীর জন্যে শাফেয়ী ইমামের পিছে এবং শাফেয়ীর জন্যে হানাফী ইমামের পিছে (নামাযের) ইক্তেদা করা বৈধ নয়। এটা সাহাবী, তাবেয়ী ও উলামায়ে সল্ফের কর্মনীতির সুস্পষ্ট বিরোধিতা। এরূপ চিন্তা ও কর্ম কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না।

মূলত এই হলো ইবনে হাযমের মন্তব্যের সঠিক তাৎপর্য। যেখানে অবস্থা এরূপ নয়, সেই ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যও প্রযোজ্য নয়। যেমন, এক ব্যক্তি কেবল রাসূলুল্লাহ্র (সা) বক্তব্যের ভিত্তিতেই দীনকে দীন মনে করে, আল্লাহ ও রাসূল যা হালাল করেছেন, সেটাকেই হালাল মনে করে, আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন সেটাকেই অবৈধ মনে করে এবং কোনো অবস্থাতেই কোন মানুষের বক্তব্যকে বৈধতা ও অবৈধতার মানদণ্ড বানায় না।

কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ ঈমান আকীদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সে কুরআন হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে না, বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা রাখেনা এবং কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা রাখে না, সেহেতু সে যদি তার দৃষ্টিতে সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে ফতোয়া দেবার উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের ইক্তেদা-অনুসরণ করে এবং মনে এই চিন্তা রাখে যে, যখনই সে আলিমের কোনো ফতোয়া কুরআন সুন্নাহ্র প্রমাণিত দলিলের বিপরীত দেখতে পাবে, তখনই তা ত্যাগ করবে, কোনো প্রকার গোঁড়ামী করবে না, এরূপ ব্যক্তির জন্যে তাকলীদকে কিছুতেই অবৈধ বলা যেতে পারে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্র সে যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া দেয়ার এ নিয়মই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। সুতরাং এই নীতিতে আমল করার পর এক ব্যক্তির কাছে সবসময় ফতোয়া কিংবা বিভিন্ন ফকীহ্র নিকট বিভিন্ন সময় ফতোয়া চাওয়া উভয়টাই বৈধ। এটা কেমন করে অবৈধ হতে পারে? কারণ আমি তো কোনো ফকীহ্র ব্যাপারে এরূপ ঈমান পোষণ করি না যে, 'তাঁর নিকট আল্লাহ তাআলা ফিকাহ সংক্রান্ত ওহী নাযিল করেন, তাঁর ইতায়াত করা আমার জন্যে ফরয এবং তিনি নিষ্পাপ।' আমি যখন কোনো ফকীহ্র ইক্তেদা করি, তখন তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা নিয়েই তাঁর ইক্তেদা করি যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের একজন আলিম। সুতরাং তাঁর বক্তব্য কুরআন সুন্নাহ্ মুতাবিকই হবে। হয় সরাসরি কুরআন হাদীস দিয়েই কথা বলবেন, কিংবা কুরআন হদীসের ভিত্তিতে ইস্তিম্বাত করে কথা বলবেন।..... এরূপ না হলে তো কোনো মুমিনই কোনো

মুজতাহিদের তাকলীদ করতো না। কোনো বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য সূত্রে যদি আল্লাহ্‌র সেই মাসুম রাসূলের (সা) কোনো হাদীস আমার নিকট পৌঁছে, যাঁর আনুগত্য করা আমার জন্যে ফরয, সেই হাদীসটি যদি আমার ইমামের (বা মাযহাবের) মতের বিরোধী হয়, তখন যদি আমি হাদীসটিকে ত্যাগ করে ইমামের মতকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে গোঁড়ামী প্রদর্শন করি, তাহলে আমার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এক্ষেত্রে কিয়ামতের দিন রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমি কি জবাব দেবো?

২. তাকলীদ-এর পর মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে বড় সমস্যার কারণ হয়েছে কুরআন হাদীসের শাব্দিক অনুসরণ এবং ইস্তেখরাজ।

এখানে দু'টি নিয়ম রয়েছে। একটি হলো, হাদীসের শাব্দিক অনুসরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো, মুজতাহিদ ইমামদের প্রণীত উসূলের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করা। শরয়ী দিক থেকে এই দু'টি নিয়মই সর্বস্বীকৃত। সকল যুগের বিজ্ঞ ফকীহগণ দু'টি বিষয়ের প্রতিই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে কেউ একটির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন, আবার কেউ অপরটির প্রতি বেশী যত্নবান হন। কিন্তু কোনো একটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কেউ করেননি। সুতরাং হক পথের কোনো পথিকেরই কেবল একটি মাত্র পন্থার প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়া উচিত নয়। অথচ দুঃখের বিষয়, বর্তমানকালে এই প্রবণতাই সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এই ভ্রান্ত প্রবণতাই তাদের গোমরাহীর জন্যে দায়ী। এই দু'টি পন্থার একটিকে বাদ দিয়ে বাকী একটি দ্বারা হিদায়াতের রাজপথের সন্ধান পাওয়া খুবই দুষ্কর। সঠিক নীতি হচ্ছে, উভয় পন্থাকে পৃথক করে না দিয়ে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। একটি দ্বারা আরেকটির কাঠামোকে আঘাত না করে একটির সাহায্যে আরেকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা। কেবল এভাবেই অটল মজবুত ভিতের উপর দীনি বিধানের এক দুর্ভেদ্য প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে। এভাবেই তাতে কোনো ভ্রান্তির প্রবেশ পথ বন্ধ হতে পারে। এ নীতির প্রতিই আমাদেরকে অংগুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন হাসান বসরী ঃ

"আল্লাহর কসম, তোমাদের পথ হচ্ছে, সীমা থেকে দূরে অবস্থান এবং সীমাতিক্রম– এ দুটির মাঝখানে।"

৩. তৃতীয় যে জিনিসটি মুসলমানদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তা হলো শরয়ী বিধান জানার জন্যে কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ অনুকরণগত তারতম্য।

শরয়ী বিধান অবগত হবার জন্যে কুরআন ও হাদীসের যে অনুসরণ করা হয়,

তার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম মর্যাদা হলো, কুরআন সুন্নাহর আলোকে শরয়ী বিধানসমূহ সম্পর্কে এতোটা বিজ্ঞতা অর্জন করা, যাতে করে প্রশ্নকর্তাদের প্রায় সমস্ত প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই দেয়া যায় এবং মানব জীবনে সংঘটিত সকল ঘটনাবলীর শরয়ী সমাধান অবগত হবার জন্যে তার অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়, অনেক নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। এটা হচ্ছে ইজতিহাদের মর্যাদা। আর এর যোগ্যতা অর্জন করার কয়েকটি পন্থা রয়েছে ঃ

ক. কখনো এ যোগ্যতা অর্জিত হয় হাদীসের ভাণ্ডার নিয়ে চিন্তা গবেষণা ও সংগ্রহ-সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং শায ও গরীব হাদীসমূহের নিরীক্ষণের মাধ্যমে। এ মত পোষণ করেন আহমদ ইবনে হাম্বল। কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, কেবল চিন্তা গবেষণা ও যাচাই বাছাইর কাজই এই বিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে যথেষ্ট। বরঞ্চ সেইসাথে এরূপ ব্যক্তিকে ভাষাতত্ব ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুপণ্ডিত হতে হবে। প্রাচীন আলিমগণ বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে কিভাবে সমতা বিধান করেছেন এবং তাঁদের দলিল গ্রহণ পদ্ধতি কি ছিলো, সে সম্পর্কেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। খ. কখনো এ যোগ্যতা অর্জিত হয় তাখরীজের উসূলসমূহকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এজন্য কেবল ইমাম মুজতাহিদ প্রণীত উসূলের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করার পন্থা অবগত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ হাদীস এবং আছারের একটা বিরাট অংশ তাঁর আয়ত্তে থাকতে হবে। যাতে করে সর্বসম্মত কোনো মতের সাথে তাঁর ইস্তিম্বাত সাংঘর্ষিক হয় কিনা–তা তিনি জানতে পারেন। এটাই হচ্ছে তাখরীজকারীদের পন্থা। গ. দুই বলয়ে অবস্থিত উপরোক্ত দু'টি পন্থার মধ্যবর্তী ও সঠিক পন্থা হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে এতোটা অবগতি থাকা, যাতে করে ফিকাহ্র উসূল ও মৌলিক মাসায়েলসমূহ এবং সেগুলোর দলিল প্রমাণ সংক্রান্ত জ্ঞান অতি সহজেই অর্জন করা যায়। তাছাড়া এরূপ ব্যক্তিকে কিছু কিছু ইজতিহাদী মাসআলা, সেগুলোর দলিল-আদিল্লা ও একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যদের তাখরীজের ত্রুটি নির্দেশ এবং খাঁটি ও মেকীর মধ্যে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তবে একজন মুজতাহিদ মতলককে যতোটা ব্যাপক ও সমুদ্রসম জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টির অধিকারী হতে হয়, তার মধ্যে সেসব শর্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকলেও চলবে। এ পর্যায়ে পৌছার পর বিভিন্ন মাযহাবের ত্রুটিপূর্ণ মতসমূহের

সমালোচনা করা তাঁর জন্যে বৈধ। তবে সমালোচনা করার পূর্বে তাঁকে অবশ্য সেগুলোর পক্ষে তাদের যেসব দলিল প্রমাণ আছে, সেগুলো অবহিত হতে হবে। এ পর্যায়ে পৌছে বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের দলিল প্রমাণ পর্যালোচনার পর তিনি যদি এই মাযহাবের কিছু এবং ঐ মাযহাবের কিছু মত গ্রহণ করেন এবং তাঁর গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হওয়ায় সব মাযহাবেরই কিছু মতের সমালোচনা করেন এবং বর্ণনা করেন, যদিও প্রাচীনরা তা গ্রহণ করেছেন, তবে এমনটি করাও তাঁর জন্যে বৈধ।

এ কারণেই দেখা যায়, যেসব আলিম নিজেদেরকে মুজতাহিদ মতলক বলে দাবী করতেন না, তাঁরা ফিকহী গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন, মাসআলা সংকলন করেছেন, তাখরীজ করেছেন এবং পূর্ববর্তী আলিমগণের একটি মতকে আরেকটি মতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ ইজতিহাদ আর তাখরীজ তো মূলত একই জিনিসের দু'টি অংশ। আর উভয়টিরই উদ্দেশ্য কোনো বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌছা বা সত্যিকার ধারণা লাভ করা।

এবার ঐসব লোকদের কথায় আসা যাক, যারা মাসায়েল যাচাই বাছাই করার মতো দীনি জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাদের উচিত প্রচলিত যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষ ও স্থানীয় মুসলমানদের অনুসরণ করা। আর যখন কোনো নতুন বিষয় তাদের সামনে আসবে, সে বিষয়ে নিষ্ঠাবান মুফতীগণের নিকট ফতোয়া চাওয়া আর মামলা মুকদ্দমার ক্ষেত্রে কাযীগণের ফায়সালা অনুসরণ করা। এটাই তাদের জন্যে সরল সঠিক ও উত্তম পন্থা।

প্রত্যেক মাযহাবের প্রাচীন ও আধুনিক মুহাক্কিক আলিমগণকে এইরূপ চিন্তা চেতনার অধিকারীই পেয়েছি। সকল মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের সাথী ও ছাত্রদেরকে এই ধারণার অনুসরণেরই অসীয়ত করেছেন। 'ইয়াকুত ও জাওয়াহেরে' উল্লেখ আছে যে, আবু হানীফা (রহ) বলতেন ঃ

আমার মতের পক্ষে গৃহীত দলিলসমূহ যার জানা নেই আমার মতানুযায়ী ফতোয়া দেয়া তার উচিত নয়। আবু হানীফা স্বয়ং কোনো ফতোয়া দেয়ার সময় বলতেন ঃ "এটা নুমান বিন সাবিতের (অর্থাৎ আমার) মত। আমার নিজের বুঝ জ্ঞান অনুযায়ী আমি এটাকেই উত্তম মনে করি।"

ইমাম মালিক (রহ) বলতেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত এমন কোনো মানুষ নেই, যার পুরো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তিনি ছাড়া আর সকলের বক্তব্যের কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য

এবং কিছু অংশ বর্জনীয়।"

হাকিম ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, শাফেয়ী (রহ) বলতেন ঃ

"কোনো বিষয়ে সহীহ-বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে সে বিষয়ে সেটাই আমার মত।" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, শাফেয়ী (রহ) বলেছেন ঃ

"তোমরা যখন আমার কোনো মতকে হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ দেখতে পাবে, তখন তোমরা হাদীসের ভিত্তিতে আমল করবে এবং আমার মতকে দেয়ালের ওপাশে নিক্ষেপ করবে।"

শাফেয়ী (রহ) একদিন ইমাম মুযনীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "হে আবু ইব্রাহীম! আমার প্রতিটি কথার অন্ধ অনুকরণ (তাকলীদ) করো না। বরঞ্চ সে বিষয়ে নিজেও চিন্তা গবেষণা করা উচিত। কারণ, এটা যা-তা ব্যাপার নয়, দীনের ব্যাপার।"

তিনি আরো বলতেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর (সা) ছাড়া আর কারো কথার মধ্যে কোনো হুজ্জত নেই, তাদের সংখ্যা যদি বিরাটও হয়।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলতেন ঃ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হলে কোনো ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য নয়।"

তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন ঃ

"আমার তাকলীদ করো না। মালিক, আওযায়ী, ইব্রাহীম নখয়ী প্রভৃতি কারোই তাকলীদ করো না। তারা যেমন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছেন, তোমরাও অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই মাসআলা গ্রহণ করো। সকল ইমামের মাযহাব ও মতামত সম্পর্কে অবগত হওয়া ছাড়া কারোই ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। কারো নিকট যদি এমন কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, যেটির বিষয়ে স্বীকৃত ইমামগণ একমত পোষণ করেন, সেটির সেই সর্বসম্মত জবাবটি বলে দেয়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সেটা তার নিজস্ব মত নয়, বরঞ্চ ইমাম মুজতাহিদগণের মতেরই ভাষ্য বলে গণ্য হবে। তার নিকট যদি কেউ কোনো মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, সেক্ষেত্রে এটা অমুকের মতে জায়েয আর অমুকের মতে নাজায়েয জবাব দেয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে এক পক্ষের

মত বলে দেয়া উচিত নয়।"

আবু ইউসুফ ও যুফার (রহ) প্রমুখ বলেছেন ঃ

"এমন কোনো ব্যক্তির আমাদের মত অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া উচিত নয়, যিনি আমাদের মতের ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নন।"

ইমাম আবু ইউসুফকে বলা হয় ঃ 'আবু হানীফার সাথে আপনার ব্যাপক মতপার্থক্য লক্ষ্য করছি।' তিনি তাকে জবাবে বলেন ঃ "এর কারণ, আবু হানীফাকে যতোটা বুঝ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, ততোটা আমাদেরকে দেয়া হয়নি। তিনি তাঁর বুঝ জ্ঞানের মাধ্যমে যা অনুধাবন করেছেন, তার সবটা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তাঁর যে বক্তব্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, তা দিয়ে ফতোয়া দেয়া আমাদের জন্যে বৈধ হতে পারে না।"

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কখন একজন লোক ফতোয়া দেয়ার বৈধতা অর্জন করে? জবাবে তিনি বলেন ঃ "ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করলে।" জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ 'কিভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জিত হয়?' জবাবে তিনি বলেন ঃ "যখন কোনো ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মাসায়েলের সকল দিকের উপর নযর দিতে পারেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করা হলে যুক্তিসংগত জবাব দিতে পারেন, তখন তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেন।"

কেউ কেউ বলেছেন ঃ "ইজতিহাদের ন্যূনতম শর্ত হলো 'মাবসূত' গ্রন্থ মুখস্থ থাকা।" ইবনুস সিলাহ বলেছেন ঃ "শাফেয়ী মাযহাবের কোনো ব্যক্তির নযরে যদি এমন কোনো হাদীস পড়ে, যেটি শাফেয়ীর মতের সাথে সাংঘর্ষিক, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি ইজতিহাদে মতলকের অধিকারী হন কিংবা সেই বিষয় বা মাসআলাটি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন, তবে বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করার পর হাদীসটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে, সেক্ষেত্রে হাদীসটির উপর আমল করা এবং তাকলীদ পরিহার করা তাঁর জন্যে জরুরী। আর তিনি যদি এরূপ যোগ্যতার অধিকারী না হন আর দেখেন যে, অপর কোন ইমামের মত হাদীসটির অনুরূপ, সে ক্ষেত্রেও হাদীসটির উপরই আমল করা তাঁর জন্য জরুরী। কারণ, এতে করে তাঁর কোনো না কোনো ইমামের তাকলীদ করা হয়ে যাচ্ছে।"– ইমাম নব্বীও এ মতই পোষণ করেন।

৪. চতুর্থ সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে ফকীহ্দের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে কেন্দ্র

করে। অথচ ফকীহদের মধ্যে তো মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব বিষয়ে, যেসব বিষয়ে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট থেকেই পার্থক্যপূর্ণ মত (ইখতেলাফ) পাওয়া গেছে। যেমন : তাশরীক ও দুই ঈদের তাকবীর, মুহরেমের (যিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন) বিয়ে, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের (রা) তাশাহুদ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে পড়া প্রভৃতি বিষয়ে। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা একটি মতকে আরেকটি মতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন মাত্র।

অতীত আলিমগণের মতপার্থক্য মূল শরীয়তের ব্যাপারে ছিল না। মতপার্থক্য হয়েছে আনুসঙ্গিক বিষয়াদিতে। আর সেসব মতপার্থক্যও ছিলো নেহাতই সাধারণ ধরনের। মতপার্থক্য ছিলো দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, তাই নিয়ে। কেউ মনে করেছেন এটি উত্তম, আবার কেউ মনে করেছেন ওটি উত্তম। যেমন, কারীগণের কিরআতের পার্থক্য। বিভিন্ন কারী বিভিন্ন দৃষ্টিভংগিতে তিলাওয়াত করেন। একই শব্দ বা আয়াতের তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তুমি বেশ পার্থক্য দেখতে পাবে। ফকীহ্‌দের মতপার্থক্যের ধরনও অনুরূপ। ফকীহ্‌গণ তাঁদের মতপার্থক্যের কারণ হিসেবে বলেছেন, এই মতও সাহাবীদের থেকে পাওয়া গেছে, ঐ মতও সাহাবীগণের (রা) নিকট থেকে পাওয়া। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যেও পারস্পরিক মতপার্থক্য ছিলো এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই হিদায়াতের উপর ছিলেন। এ কারণে হকপন্থী আলিমগণ ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সকল মুজতাহিদের ফতোয়াকেই জায়েয মনে করেন, সকল কাযীর ফায়সালাকেই স্বীকার করেন এবং অনেক সময় নিজ মাযহাবের বিপরীত মতের উপরও আমল করেন। এ কারণেই তুমি দেখতে পাচ্ছো, তারা মাসআলার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইখতেলাফী দিকসমূহ আলোচনার পর বলে দেন, 'আমার মতে এটাই উত্তম', 'আমার মতে এটা গ্রহণ করা ভাল'। আবার কখনো বলেন ঃ 'আমি কেবল এতোটুকুই জানতে পেরেছি।' 'আল মাবসূত', আছারে মুহাম্মাদ এবং শাফেয়ীর বক্তব্যের মধ্যে এ কথাগুলোর সাক্ষ্য তুমি দেখতে পাবে।

অতপর শুভবুদ্ধির অধিকারী দীনের সেই মহান খাদিমদের কাল অতিক্রান্ত হয়। তাঁদের পরে এমনসব লোকের আগমন ঘটে, যারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হবার কারণে হিংসা বিদ্বেষ ও বিবাদের ঝড় বইয়ে দেয়। মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোর কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরে। এ মতের অধিকারীদের এক পক্ষ আর ঐ মতের অধিকারীদের আরেক পক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকে। এভাবেই শুরু

হয় ফিরকা-পুরস্তী। এতে করে মানুষের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে তাহকীক ও চিন্তা গবেষণার জজবা। তারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবকে আঁকড়ে ধরে অন্ধভাবে। আফসোস তাদের এই অবস্থার জন্যে!

অথচ এইসব মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাঁদের পরবর্তী মহান আলিমগণের অবস্থা দেখো! তাঁরা (নামাযে) কেউ বিসমিল্লাহ পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না। কেউ তা সশব্দে পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন নিঃশব্দে। কেউ ফজরে দোয়ায়ে কুনুত পড়তেন, আবার কেউ তা পড়তেন না। কেউ নকসীর, বমি ও ক্ষৌরকার্য করার পর অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। কেউ কামনার সাথে স্বীয় লিংগ এবং স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। কেউ রান্না করা খাদ্য খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। তাদের কেউ উটের গোশ্‌ত খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না।

এতদসত্বেও তাঁদের একজন অপরজনের পিছে নামায পড়তেন। যেমন, আবু হানীফা ও তাঁর সাথীরা এবং শাফেয়ী প্রমুখ (রহ) মদীনার ইমামদের পিছে নামায পড়তেন। অথচ তাঁরা ছিলেন মালিকী ও অন্যান্য মতের লোক এবং তাঁরা সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ্ও পড়তেন না। ইমাম আবু ইউসুফ হারুনুর রশীদের পিছে নামায পড়েছেন। অথচ হারুনুর রশীদ ক্ষৌরকার্য করার পর নতুন করে অযু করতেন না। কারণ ইমাম মালিক (রহ) ফতোয়া দিয়েছেন, ক্ষৌরকার্য করার পর অযু করার প্রয়োজন নেই। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ) ক্ষৌরকার্য এবং নকসীর[৮২] -এর জন্যে অযু করার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "যদি ইমামের শরীর থেকে রক্ত বের হয় আর তিনি অযু না করেন, তবে কি আপনি তার পিছে নামায পড়বেন?" জবাবে তিনি বললেন ঃ 'কেমন করে আমি মালিক ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের পিছে নামায না পড়ে থাকতে পারি?'[৮৩]

বর্ণিত আছে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ উভয়েই ঈদে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত তাকবীরের অনুসরণ করতেন। হারুনুর রশীদের পছন্দের কারণে তাঁরা এটা করতেন। অথচ তাঁরা ইবনে মাসউদ বর্ণিত তাকবীরের অনুসারী।

---

৮২. গরমের প্রকোপে নাক দিয়ে যে রক্ত বের হয়, তাকে নকসীর বলে। –অনুবাদক
৮৩. এ দু'জনের মতে এটা অযু ভঙ্গের কারণ নয়। –অনুবাদক

একবার শাফেয়ী আবু হানীফার কবরের কাছাকাছি স্থানে ফজরের নামায আদায় করেন। এ সময় আবু হানীফার সম্মানার্থে তিনি ফজরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়েননি। তিনি বলতেন, আমি অনেক সময় ইরাকবাসীদের (আবু হানীফার) মাযহাবের উপর আমল করি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রহ) মানসুর এবং হারুনুর রশীদকে কি বলেছিলেন, এর আগে এ গ্রন্থে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি।

'আল বাযাযিয়া' গ্রন্থে ইমাম সানী অর্থাৎ আবু ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি হাম্মাম থেকে গোসল করে এসে জুমার নামায পড়ান। নামায শেষে লোকেরা চলে যাবার পর তাঁকে জানানো হয়, তিনি যে কুয়োর পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন, তাতে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। খবরটি শুনে তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, এ বিষয়ে এখন আমরা আমাদের মদীনার ভাইদের (মালিকী মাযহাবের) মতের অনুসরণ করলাম যে, দুই কুল্লা পরিমাণ পানি থাকলে তা অপবিত্র হয় না। কারণ, এ পরিমাণ পানির বিধান 'অধিক পানির' বিধানের মতো।"

ইমাম খানজাদীকে শাফেয়ী মাযহাবের এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি এক বা দুই বছরের নামায ছেড়ে দিয়েছিল, অতপর আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ করে। এখন সে কোন্ মাযহাবের রীতিতে নামাযগুলো কাযা করবে? শাফেয়ী মাযহাবের রীতিতে নাকি হানাফী মাযহাবের রীতিতে? জবাবে ইমাম খানজাদী বলেন ঃ "সে বৈধ মনে করে, এমন যে কোনো মাযহাবের রীতিতে পড়লেই নামায আদায় হয়ে যাবে।"

কোনো হানাফী মাযহাবের লোক যদি শপথ করে যে, 'আমি যদি অমুক মহিলাকে বিয়ে করি, তবে তাকে তিন তালাক দিলাম।'[৮৪] অতপর কোনো শাফেয়ী আলিমের নিকট ফতোয়া চাইলে তিনি যদি বলেন ঃ 'তালাক হয়নি, তোমার শপথ বাতিল, সেটা ছিলো একটা বাহুল্য কথা।' এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে সে যদি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এর পক্ষে বিরাট সংখ্যক সাহাবীর মত রয়েছে। এ কথাগুলো উল্লেখ

---

৮৪. উল্লেখ্য, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এভাবে শপথ করলে সেই মহিলাকে বিয়ে করার সাথে সাথে তার উপর তিন তালাক প্রযোজ্য হয়ে যাবে। –অনুবাদক

হয়েছে 'জামিউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) তাঁর 'আমালী'-তে বলেছেন ঃ "কোনো ফকীহ্ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম' এবং তার মাযহাব অনুযায়ী সে যদি এটাকে তিন তালাক বায়েন মনে করে, কিন্তু সমকালীন কাযী যদি সেটাকে তালাকে রিজয়ী (ফেরতযোগ্য) বলে ফায়সালা দেয়, তবে স্ত্রীর সাথে ঘর করার অবকাশ তার রয়েছে।"

একইভাবে হালাল হারাম, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্কের সেইসব বিষয়ে, যেগুলোর ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, প্রত্যেক ফকীহ্র উচিত সেসব বিষয়ে ইসলামী আদালত তার মাযহাবের বিপরীত রায় দিলেও সে রায়ের উপর আমল করা এবং সেসব ক্ষেত্রে স্বীয় মাযহাবের উপর আমল না করা।

আলোচনাকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করলাম। যেসব কারণে বিভিন্ন মাযহাব ও দল উপদলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লেগে আছে, সেগুলোর কারণ উদঘাটিত করা এবং সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেয়াই এ দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য। কেউ যদি বিদ্বেষী এবং অতি সংকীর্ণ ও অতি উদার মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ন্যায় ও সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ কথাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, তবে সত্য ও সঠিক পথের অনুসরণের জন্যে এ কথাগুলোই তার জন্যে যথেষ্ট। আর প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তো আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সমাপ্ত



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা



ISBN 984-842-006-1